ইউনিট
২

ধ্রুপদী মতবাদ বা তত্ত্ব
Classical Theory

ভূমিকা

'ধ্রুপদী' শব্দের ইংরেজি হলো Classical যা প্রাচীন বা মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন জ্ঞানের সমাহার যা গতানুগতিকভাবে গৃহীত হয়। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর সময় হতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সময়ে প্রসার লাভ করে। এটি একটি মৌলিক তত্ত্ব যার প্রভাব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এখনো দৃঢ়ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাহী ও কর্মীদের আচরণ কী হবে এবং এদের কর্মপ্রবাহ কীভাবে চলবে এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রাচীনতম চিন্তা ভাবনাগুলো ধ্রুপদী তত্ত্বের আওতাভুক্ত। ধ্রুপদী সংগঠনে কার্যরত ব্যক্তিদের সম্পর্ক, ক্ষমতা, উদ্দেশ্য, ভূমিকা, কার্যাবলি, যোগাযোগ প্রভৃতি উপাদানগুলো এ তত্ত্বে বিরাজমান। ধ্রুপদী মতবাদে বিশ্বাসীরা কর্মীদেরকে অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে মনে করেন। তারা সংগঠনের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উপাদানের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। ধ্রুপদী মতবাদে মানুষের মূল্যায়ন সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তাধারার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ মতবাদের তিনটি ধারা রয়েছে। এগুলো হলো- (i) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy),(ii) প্রশাসনিক তত্ত্ব (Administrative) এবং (iii) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ (Scientific Management Theory)।

ইউনিট সমাপ্তির সময়:	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-২.১ঃ	ধ্রুপদী তত্ত্বের মূল ধারণা, বৈশিষ্ট্য বা অনুমানসমূহ, চারটি মৌলিক স্তম্ভ, অনুমিত শর্ত, প্রকারভেদ
পাঠ-২.২ঃ	ধ্রুপদী ও নব্য-ধ্রুপদী মতবাদের পার্থক্য, ধ্রুপদী মতবাদের সমালোচনা, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ধারণা, বৈশিষ্ট্য
পাঠ-২.৩ঃ	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধা, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপসমূহ
পাঠ-২.৪ঃ	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার পার্থক্য, বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ
পাঠ-২.৫ঃ	আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা, উপাদান, কার্যাবলি, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক
পাঠ-২.৬ঃ	প্রশাসনিক তত্ত্ব কী, বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্ত, সুবিধা-অসুবিধা
পাঠ-২.৭ঃ	হেনরি ফেয়লের পরিচিতি, ব্যবস্থাপকীয় যোগ্যতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে হেনরি ফেয়লের অবদান

পাঠ-২.১ ধ্রুপদী তত্ত্বের মূল ধারণা, বৈশিষ্ট্য বা অনুমানসমূহ, চারটি মৌলিক স্তম্ভ, অনুমিত শর্ত, প্রকারভেদ

Classical Theory, Characteristics/Assumptions, Four Key Pillars, Assumption, Kinds or Patterns

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ধ্রুপদী তত্ত্বের মূল ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ধ্রুপদী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বা অনুমানসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ধ্রুপদী তত্ত্বের চারটি মৌলিক স্তম্ভ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধ্রুপদী তত্ত্বের অনুমিত শর্ত সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ধ্রুপদী তত্ত্বের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

ধ্রুপদী মতবাদ বা তত্ত্ব

Classical Theory

'ধ্রুপদী' শব্দের ইংরেজি হলো Classical যা প্রাচীন বা মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন জ্ঞানের সমাহার যা গতানুগতিকভাবে গৃহীত হয়। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর সময় হতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সময়ে প্রসার লাভ করে। এটি একটি মৌলিক তত্ত্ব যার প্রভাব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এখনো দৃঢ়ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাহী ও কর্মীদের আচরণ কী হবে এবং এদের কর্মপ্রবাহ কীভাবে চলবে এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রাচীনতম চিন্তা ভাবনাগুলো ধ্রুপদী তত্ত্বের আওতাভুক্ত। ধ্রুপদী সংগঠনে কার্যরত ব্যক্তিদের সম্পর্ক, ক্ষমতা, উদ্দেশ্য, ভূমিকা, কার্যাবলি, যোগাযোগ প্রভৃতি উপাদানগুলো এ তত্ত্বে বিরাজমান।

ধ্রুপদী মতবাদে বিশ্বাসীরা কর্মীদেরকে অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে মনে করেন। তারা সংগঠনের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উপাদানের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। ধ্রুপদী মতবাদে মানুষের মূল্যায়ন সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তাধারার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ মতবাদের তিনটি ধারা রয়েছে। এগুলো হলো- (i) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy),(ii) প্রশাসনিক তত্ত্ব (Administrative Theory) এবং (iii) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ (Scientific Management Theory)।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রাচীনকালে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক চিন্তা ভাবনা থেকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে সকল জ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছে, তা-ই ধ্রুপদী মতবাদ বা তত্ত্ব নামে পরিচিত।

ধ্রুপদী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য/অনুমানসমূহ

Characteristics/Assumptions of Classical Theory

ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী তত্ত্বে নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ তত্ত্বের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এর অনুমিত শর্ত হিসেবেও স্বীকৃত। নিচে এ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্তগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. **কেন্দ্রীকরণঃ** ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী তত্ত্ব কেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার হাতে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

২. **আনুষ্ঠানিকতাঃ** এ তত্ত্বে কর্মী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সব কার্যক্রম তথা নিয়ম রীতিতে অনানুষ্ঠানিকতার স্থান নেই।

৩. **স্থায়ী রূপরেখাঃ** এ তত্ত্বে ব্যবস্থাপকদের কাজের স্থায়ী রূপরেখা বা পদ্ধতি থাকে যাতে সংগঠন কাঠামোতে কেউ অনুপস্থিত থাকলে ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদনে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি আপন ধারায় চলতে থাকে।

৪. **অভ্যন্তরীণ উপাদানের ওপর গুরুত্বারোপঃ** এ তত্ত্বে মেশিন এবং কর্মীকে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।

৫. **যৌক্তিক ব্যবস্থাপনাঃ** এ তত্ত্বে ব্যবস্থাপককে যুক্তিনির্ভর, বাস্তববাদী, বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যবস্থাপক সজ্ঞানে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাঁর শাস্তির বিধান থাকবে।

৬. **সর্বজনীনতাঃ** এ তত্ত্বে ব্যবস্থাপনার কতিপয় কাজ এবং ব্যবস্থাপনীয় কার্য সম্পাদনে কতিপয় নীতিমালা প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে সমভাবে প্রয়োগযোগ্য। এজন্যই ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি ও নীতিমালা সর্বজনীন বলা হয়েছে।

৭. **মানুষসম্পর্কিত অর্থনৈতিক ধারণাঃ** এ তত্ত্বে কর্মীকে অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে তাদেরকে আর্থিক পুরস্কারের জন্য প্রেষণাদানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ফলে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়। তবে এ তত্ত্বে মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৮. **শৃঙ্খলাঃ** এ তত্ত্বে শৃঙ্খলাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে সুশৃঙ্খলভাবে সাংগঠনিক কার্যসম্পাদন করা সম্ভব হয়।

৯. **নৈর্ব্যক্তিকতাঃ** এ তত্ত্বে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি অবস্থানের কার্য বর্ণনা করে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ফলে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে কর্মীর পক্ষে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়।

১০. **কাজের আদর্শ মাত্রা নির্ধারণঃ** এ তত্ত্বে কাজের আদর্শ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে কাজের গুণগত মান ঠিক থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, 'ধ্রুপদী' তত্ত্বের মাধ্যমে অতি সহজে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

ধ্রুপদী তত্ত্বের চারটি মৌলিক স্তম্ভ

Four Key Pillars of Classical Theory

ঊনবিংশ শতাব্দির শুরুতে ধ্রুপদী তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এটি চারটি মৌলিক স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। নিচে ধ্রুপদী তত্ত্বের মৌলিক স্তম্ভ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

১. **শ্রমবিভাগঃ** ধ্রুপদী তত্ত্বের মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমবিভাগ ধারণাটি। এর ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য ধারণা প্রসার লাভ করে। দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করতে হলে কার্যের বিন্যাসকরণ ও বিশেষিকরণের প্রয়োজন। সাংগঠনিক কাঠামো স্বাভাবিকভাবে বিশেষায়নের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বিশেষায়িত কার্যের সংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা নির্ভর করে।

২. **পর্যায়ক্রমিক ধাপ ও কার্যভিত্তিক প্রক্রিয়াঃ** প্রতিষ্ঠানের উল্লম্ব এবং সমান্তরাল কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে পর্যায়ক্রমিক ধাপ এবং কার্যভিত্তিক প্রক্রিয়াসমূহ। পর্যায়ক্রমিক ধাপের বিষয়টি আদেশের ঐক্য, নির্দেশনার ঐক্য, ক্ষমতা হস্তান্তর, পরিচালনা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কার্যভিত্তিক প্রক্রিয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের বিভাজন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক কাঠামোর সরলরৈখিক ও পদস্থকর্মীর সমান্তরাল কর্তৃত্বের নির্দেশ করে।

৩. **কাঠামোঃ** সাংগঠনিক কার্যাবলির যুক্তিপূর্ণ সম্পর্কের উপস্থাপনই হলো কাঠামো। কাঠামো কার্যের পদ্ধতি এবং রূপরেখা বর্ণনা করে। ধ্রুপদী তত্ত্বে দুটি কাঠামো ব্যবহারের কথা বলা হয়। একটি হল সরলরৈখিক কাঠামো এবং অপরটি হলো পদস্থকর্মী কাঠামো।

৪. **তদারকির পরিধিঃ** একজন ব্যবস্থাপক যতজন অধঃস্তন কর্মীর কাজ ভালোভাবে তদারক করতে পারেন সেই সংখ্যাই হলো তদারিকি পরিধি। বিশেষজ্ঞগণ ব্যবস্থাপকের অধঃস্তন কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাকে সীমিত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। উপর্যুক্ত আলোচিত মৌলিক স্তম্ভের ওপর ধ্রুপদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। উক্ত স্তম্ভ প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ধ্রুপদী তত্ত্বের অনুমিত শর্ত বা প্রভাববিস্তারকারী উপাদান

Assumption or Influencing Factors of Classical Theory

ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনার কতিপয় অনুমিত শর্ত রয়েছে। ধ্রুপদী তত্ত্বের অনুমিত শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

১. **কেন্দ্রীয়করণঃ** ধ্রুপদী তত্ত্বটি মূলত কেন্দ্রীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হতে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের কার্য সম্পন্ন হবে। সেখান থেকেই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণ ক্ষমতা শীর্ষ ব্যবস্থাপনার হাতে ন্যস্ত থাকবে। অর্থাৎ শীর্ষ ব্যবস্থাপনাই নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃপক্ষ।

২. **মেশিন এবং এর উপাদানঃ** এ মতবাদে সংগঠনকে একটি মেশিন এবং এতে কর্মরত কর্মীদেরকে যন্ত্রের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ শ্রমিক-কর্মীদেরকে যন্ত্র বা অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয় এ তত্ত্বে।

৩. **মানুষসম্পর্কিত ধারণাঃ** এ তত্ত্বে কর্মীদের অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে প্রেষণাদানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর্মী সর্বোচ্চ মজুরি পেলেই কাজ করবে, এটি এ তত্ত্বের মূল কথা।

৪. **স্থায়ী কাঠামোঃ** ধ্রুপদী তত্ত্বে প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের কাজের আওতা এবং কার্যপদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করেই কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার একটি বিন্যস্ত কাঠামো থাকে। এতে কোনো একজনের পরিবর্তে অন্য একজন দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ তত্ত্বে কাঠামোতে পরিবর্তনশীলতার সুযোগ কম।

৫. **সার্বজনীনতাঃ** এটি একটি সার্বজনীন তত্ত্ব, এখানে যে সমস্ত কাজ ও নীতিমালার কথা বলা হয়েছে তা সব ধরনের সংগঠনের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ ছোট-বড়, উৎপাদন, বণ্টন, সেবামূলক প্রভৃতি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে এ তত্ত্বের ধারণা সমভাবে কার্যকর।

৬. **শ্রম বিভাগঃ** ধ্রুপদী তত্ত্বে বিশেষায়নের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক কাজকে ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেয়া এবং সঠিক কাজের জন্য যোগ্যতম লোককে নিয়োগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

৭. **মৌলিক ধারাঃ** ধ্রুপদী তত্ত্বে তিনটি ধারা রয়েছে। এগুলো হলো- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব, প্রশাসনিক তত্ত্ব এবং আমলাতন্ত্র। এগুলো ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার সবচেয়ে দরকারি উপাদান।

৮. **আনুষ্ঠানিকতাঃ** ধ্রুপদী তত্ত্বের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সংগঠন কাঠামো এবং কর্মীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ওপর জোর দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিট কাজেই কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এখানে পূর্ব নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী সব ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

ধ্রুপদী তত্ত্বের প্রকারভেদ বা ধরন

Kinds or Patterns of Classical Theory

ধ্রুপদী ব্যবস্থাপনার কতিপয় অনুমিত শর্ত রয়েছে। ধ্রুপদী তত্ত্বের অনুমিত শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management)ঃ শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ সময় কিছু পন্ডিত, পেশাজীবী, ব্যবস্থাপক শিল্পপতি প্রমুখ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেন এবং অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন Henry Poor, Henry R. Towne, Henry Metcalfe, Frederic Halsey, Herrington Emerson, Henry L. Gantt, Frank B. Lillian M. Gilbreth Frederic Winslow Taylor প্রমুখ। তাঁরা সকলে একসাথে ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করেন। তাঁরা ব্যবস্থাপনার সর্বক্ষেত্রকেই সমৃদ্ধ করেন। তবে তাঁদের অবদান মূল্যায়নপূর্বক সকলেই একমত হবেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি প্রয়োগ করার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য কতকগুলো উপাদানের প্রয়োজন, তাহলো সময় নিরীক্ষা (Time Study), গতি নিরীক্ষা (Motion Study), শ্রান্তি নিরীক্ষা (Fatigue Study), উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning), উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control), যন্ত্রপাতি বিন্যাস (Plant layout), উৎসাহমূলক মজুরি (Wage incentive) প্রভৃতি।

বাস্তবে বহু লোকের পরিশ্রমের ফসল হলো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, কিন্তু F. W. Taylor কেই এ ব্যবস্থাপনার পুরোধা হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে তিনি Henry R. Towne এর দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। Taylor নিজেই বলেছেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হলো শত জ্ঞানের কাজের অবদান। তথাপি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ও রূপায়নে টেলরই প্রথম।

F. W. Taylor ১৮৭৮ সালে মিডভ্যাল স্টিল কোম্পানিতে প্যাটার্ন মেকার (Pattern Maker) হিসেবে যোগ দেন এবং ১৮৮৪ সালে ঐ কোম্পানির প্রধান প্রকৌশলী (Chief Engineer) হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর তিনি বেথেল হেম স্টিল কোম্পানিতে যোগদান করেন। দুই দশক পর্যন্ত তিনি অনেক গবেষণা করেন। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র (Article) হলো 'A piece rate system' প্রকাশিত হয় ১৯০০ শতকে। এতে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ তুলে ধরেন। তাঁর নীতির মধ্যে রয়েছেঃ

(i) শ্রমিকগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্বাচিত হতে হবে; প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে যে কাজের জন্য উপযোগী, যে কাজে নিয়োগ দেয়া উচিত।
(ii) পুরাতন ধ্যান-ধারণা পাল্টে ফেলে বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থাৎ সংগঠিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে।
(iii) কাজের পরিকল্পনাকারী ও কাজের বাস্তবায়ন কারীদের মধ্যে সু-সমন্বয় থাকতে হবে এবং
(iv) ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকগণকে কাজের জন্য সমভাবে দায়িত্ব বহন করতে হবে।

১৯০৩ সালে তিনি তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্র "Shop Management" উপস্থাপন করেন। তাঁর কাজের মূল তত্ত্ব হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের সহযোগীতায় সমাজের সকল ভাল কাজ করা সম্ভব। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁর দর্শন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ করেছেন, তা হলো "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ছিল ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মানসিক বিপ্লব। তিনি পুনরোল্লেখ করেন যে, যদি না উভয় পক্ষ হতে সম্পূর্ণরূপে মানসিক বিপ্লব হবে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব থাকবে না। যাই হোক, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে সংগঠিত, কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত গবেষণা ও কাজ শুরু হয়।

(খ) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)ঃ আমলাতন্ত্রের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। এটি প্রাচীন চীন এবং রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমান কালে আমরা যে আমলাতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে অবগত আছি, তা বেশিদিনের পুরনো নয়। শিল্প বিপ্লবের পর যখন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়, তখনই আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা যখন অপর্যাপ্ত এবং শ্রমিকদেরকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে মনে হতে লাগলো তখন আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব হিসেবে, প্রকাশ করার জন্য অনেকেই কাজ করতে লাগলো। এ বিষয়ে Richard Hall, Michael Crosier ও Robert Matron এর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এটিকে প্রসিদ্ধ করে তোলে Max Weber এবং তিনিই এর জনক হিসেবে পরিগণিত। প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমলাতন্ত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমনঃ
(i) পদের পর্যায়ক্রম (Hierachy);
(ii) পেশাগত মানের ওপর গুরুত্বারোপ;
(iii) কর্মীদের নির্বাচনে স্বচ্ছলতা ও সঠিকতা;
(iv) সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়ম-কানুন ও প্রক্রিয়া অনুসরণ;
(v) কর্মীদের কর্তব্য ও দায়িত্বের সুস্পষ্টতা ইত্যাদি।
আমলাতন্ত্রের কতিপয় সুবিধা রয়েছে, যেমনঃ
(i) এটি বিশেষীকরণে বিশ্বাসী

(ii) এটি স্থায়ী ও পূর্বানুমানযোগ্য
(iii) এটি যৌক্তিক
(iv) এটি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী
(v) সর্বোপরি, এটি পক্ষপাতহীন।

তবে এর কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে, যেমনঃ
(i) এটি একরোখা (Rigid);
(ii) এটি নৈব্যক্তিক বা সম্পর্কহীন।
(iii) উদ্দেশ্যের কোনো নির্দিষ্টতা নেই।
(iv) সীমিত বিভাজন।
(v) অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
(vi) অতিরিক্ত উদ্বিগ্নতা।

আমলাতন্ত্রের সুবিধা-অসুবিধা যাই হোক না কেন, আমলাতন্ত্রকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

(গ) প্রক্রিয়া বা কার্যসংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ (Process or Functional Approach)ঃমানুষের ধারণা ব্যবস্থাপনা হলো একটি সর্বজনীন এবং সকল কাজের ক্ষেত্রেই এটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তারা আরো মনে করে যে সব আকারের ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠানেই একই ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। তবে কিছু লোক ব্যবস্থাপনা কাজের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং তাঁরাই ব্যবস্থাপনাকে কার্যসংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ফ্রান্সের শিল্পপতি Henri Fayol কে এ অ্যাপ্রোচের জনক বলে অভিহিত করা হয়। তবে James D. Mooney, Luther Gullick, Lyndall Urwick এর মত প্রখ্যাত ব্যক্তিদেরও এ স্কুল বা মতবাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। Henry Fayol কে এ মতবাদের জনক বলা হয় এ কারণে যে, তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনাকে প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং বলেন, কীভাবে এ প্রক্রিয়া কতিপয় নীতির আলোকে কার্যকর হবে।

Henri Foyal ১৯১৬ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে নব্য ধ্রুপদী বই রচনা করেন। যার নাম “Administration Industriele et General যার ইংরেজি অনুবাদ হলো “General and Industrial Management” । ইংরেজিতে অনুবাদের পূর্বে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার লোকজন এটি সম্পর্কে জানতো না। ১৯৪৯ সালে এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। এতে Henri Foyal ব্যবস্থাপনার নীতি ও কার্যক্রমকে জোড়ালোভাবে তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীর কাজ ঃ	শিক্ষার্থীগণ ধ্রুপদী তত্ত্বের ধারণা, বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্তসমূহ ও প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা খাতায় লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

‘ধ্রুপদী’ শব্দের ইংরেজি হলো Classical যা প্রাচীন বা মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি এমন জ্ঞানের সমাহার যা গতানুগতিকভাবে গৃহীত হয়। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর সময় হতে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সময়ে প্রসার লাভ করে। এটি একটি মৌলিক তত্ত্ব যার প্রভাব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এখনো দৃঢ়ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাহী ও কর্মীদের আচরণ কী হবে এবং এদের কর্ম প্রবাহ কীভাবে চলবে ইত্যকার বিষয়গুলো নিয়ে প্রাচীনতম চিন্তা ভাবনাগুলো ধ্রুপদী তত্ত্বের আওতাভুক্ত। ধ্রুপদী সংগঠনে কার্যরত ব্যক্তিদের সম্পর্ক, ক্ষমতা, উদ্দেশ্য, ভূমিকা, কার্যাবলি, যোগাযোগ প্রভৃতি উপাদানগুলো এ তত্ত্বে বিরাজমান। এ তত্ত্বের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন- কেন্দ্রীকরণ, আনুষ্ঠানিকতা, স্থায়ী রূপরেখা, যৌক্তিক ব্যবস্থাপনা, মানুষসম্পর্কিত অর্থনৈতিক ধারণা, শৃংখলা, কাজের মাত্রা নির্ধারণ প্রভৃতি। এ তত্ত্বের চারটি স্তম্ভ রয়েছে, যেমন- শ্রমবিভাগ, পর্যায়ক্রমিক ধাপ, কাঠামো, তদারকির পরিধি। এ তত্ত্বের কিছু অনুমিত শর্ত রয়েছে, যেমন- কেন্দ্রীকরণ, মেশিন ও এর উপাদান, মানুষসম্পর্কিত ধারণা, স্থায়ী কাঠামো, সর্বজনীনতা, শ্রমবিভাগ, মৌলিক ধারণা, আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি। এ তত্ত্ব তিন প্রকার- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনিক তত্ত্ব।

পাঠ-২.২ ধ্রুপদী ও নব্য-ধ্রুপদী মতবাদের পার্থক্য, ধ্রুপদী মতবাদের সমালোচনা, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ধারণা, নীতি, বৈশিষ্ট্য

Difference between Classical theory & Neo-classical theory, Criticism of Classical theory, Characteristics of Scientific Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ধ্রুপদী ও নব্য-ধ্রুপদী মতবাদের পার্থক্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ধ্রুপদী মতবাদের সমালোচনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এর নীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ধ্রুপদী তত্ত্ব ও নিউ-ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য

Difference between Classical theory & Neo-classical theory

শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তনকে সুষ্ঠুভাবে কার্যে প্রয়োগের জন্য ধ্রুপদী মতবাদের উৎপত্তি হয়। তবে এ তত্ত্বে কর্মীকে অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এ ধারণা পরিবর্তন করে শ্রমিক-কর্মীদেরকে সামাজিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ ((Neo-classical) এর বিকাশ ঘটে। ধ্রুপদী মতবাদ ও নব্য ধ্রুপদী মতবাদের কতকগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

পার্থক্যের বিষয়	ধ্রুপদী তত্ত্ব বা মতবাদ	নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্ব বা মতবাদ
১. প্রকৃতি	এ মতবাদ নৈর্ব্যক্তিক ও যান্ত্রিক সাংগঠনিক কাঠামো নির্ভর বলে প্রতীয়মান হয়।	পক্ষান্তরে এ তত্ত্বকে সামাজিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
২. গুরুত্ব	এ মতবাদে শৃঙ্খলা ও যৌক্তিকতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।	এ মতবাদে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সামাজিক চাহিদার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
৩. প্রয়োগ	এ তত্ত্বে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও কঠোর রীতি-নীতি প্রয়োগ করা হয়।	এ মতবাদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।
৪. কার্যকারণ	এ তত্ত্বানুযায়ী নীতি ও নিয়মাবলীর কার্যকারণ হচ্ছে সাংগঠনিক আচরণ।	এ তত্ত্বানুযায়ী ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং মনোভাবের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সাংগঠনিক আচরণ।
৫. কর্মী মূল্যায়ন	এ তত্ত্বে কর্মীদেরকে অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।	এ তত্ত্বে কর্মীদের সামাজিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
৬. আলোচ্য বিষয়	এ তত্ত্বে কর্মীর কার্যাবলি ও অর্থনৈতিক চাহিদার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।	এ তত্ত্বে কর্মীদের আবেগ-অনুভূতি ও সামাজিক চাহিদার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।
৭. লক্ষ্যের ভিন্নতা	এ মতবাদ অনুযায়ী কর্মীরা সর্বাধিক পরিশ্রম করে এবং দক্ষতানুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হয়।	সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মীরা মনোযোগ দিয়ে কাজ করে, এখানে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া কম।
৮. ধারা	এ মতবাদ অতিমাত্রায় যান্ত্রিক।	এ মতবাদ মানবিক।

সুতরাং দেখা যায় যে, ধ্রুপদী ও নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্বের মধ্যে উপরিউক্ত পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান। তবে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য স্থির করে উভয় তত্ত্বের প্রয়োগ করা হলে সর্বাধিক ফলপ্রদতা অর্জন করা সম্ভব।

ধ্রুপদী তত্ত্বের সমালোচনা

Criticism of Classical theory

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারায় ধ্রুপদী তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও কতিপয় ব্যবস্থাপনাবিদ ও গবেষক এ তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। নিম্নে ৫টি দৃষ্টিকোণ হতে এ তত্ত্বের সমালোচনা উপস্থাপন করা হলোঃ

১। **অনুমিতির অবাস্তবতাঃ** ধ্রুপদী তত্ত্বটি কতিপয় অনুমিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এর অধিকাংশই প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) সাংগঠনিক স্থবিরতাঃ এ তত্ত্বে প্রতিষ্ঠানকে স্থবির প্রকৃতির বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সংগঠন স্থবির নয় বরং গতিশীল বলে বিবেচিত হয়।

(খ) মানবিক আচরণঃ এ তত্ত্বে মানুষকে অর্থনৈতিক একটি সহজ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ ব্যবস্থাকপদের নিকট থেকে মানবিক আচরণ প্রত্যাশা করে।

(গ) প্রণোদনার উপাদানঃ এ তত্ত্বে কর্মীদের প্রণোদনার ক্ষেত্রে অর্থকে প্রধান উদ্দীপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে অর্থ দ্বারা সর্বক্ষেত্রে কর্মীদের উৎসাহিত করা যায় না।

২। **ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতাঃ** ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে এ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা যায়নি। নিচে এ প্রক্রিয়ার সমালোচনাগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) সমনীতিঃ এ তত্ত্বে ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সর্বত্র সমভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছে; কিন্তু বাস্তবে সর্বক্ষেত্রে এটি সমভাবে প্রয়োগ করা যায় না।

(খ) আদেশের ঐক্য নীতিঃ এ তত্ত্বে ধরে নেয়া হয় যে, সংগঠনে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মী শুধু একজন উর্ধ্বতনের নিকট হতে আদেশ প্রাপ্ত হবে কিন্তু বাস্তবে এ ধারণা সব সময় কার্যকর নয়।

(গ) সার্বজনীনতার অভাবঃ এ তত্ত্বে ব্যবস্থাপনার নীতিমালা সার্বজনীন বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত পরিবেশের জন্য ব্যবস্থাপনার নীতিমালা সর্বক্ষেত্রে একইভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

৩। **আমলাতান্ত্রিক আচরণঃ** Max Weber এ তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও আইনকানুনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এতে আমলাতান্ত্রিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু বর্তমান কালে সহযোগিতামূলক আচরণের দ্বারা কর্মীদের নিকট হতে কাঙ্ক্ষিত কাজ আদায় করে নেয়া সম্ভব। ফলে এ ধারণা কোনো কোনো ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য নয়।

৪। **মানবিক উপাদান অবহেলাঃ** এ তত্ত্বে মানুষ এবং বাহ্যিক পরিবেশ দুই ধরনের উপাদান বিশেষভাবে বিবেচ্য। এতে মানুষকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বাহ্যিক পরিবেশের প্রযুক্তি বিশেষায়ন, নিয়ন্ত্রণ, শ্রমবিভাগ ইত্যাদির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৫। **সমন্বয়ের অভাবঃ** এ তত্ত্বে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কর্মীদের কার্যের সমন্বয় সাধনের কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। ফলে সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

৬। **প্রায়োগিক গবেষণার অভাবঃ** এ তত্ত্ব অধিকাংশই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো দেখানো হয়েছে। এতে প্রায়োগিক গবেষণার কোনো প্রভাব নেই। ফলে কার্য সম্পাদনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে এ তত্ত্ব যতটা কার্যকর মনে করা হয়েছিল, ঠিক ততটা নয়।

সুতরাং বলা যায় যে, মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এ তত্ত্ব যথেষ্ট অবদান রাখে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এর কার্যকারিতা কিছুটা কমে যায়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ধারণা

Concept of Scientific Management

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ থেকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের উদ্ভব। গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ব্যর্থতার জন্যই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্ম। অর্থাৎ চিরাচরিত পদ্ধতির ওপর নির্ভর না করে করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতি ও নীতির আলোকে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করাই হলো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। এটি ধ্রুপদী মতবাদের একটি উপাদান। এটি উনিশ শতকের প্রথমদিকে আত্মপ্রকাশ করে। ফ্রেডারিক উইনস্লো টেইলর (F. W Taylor) এই তত্ত্বের জনক। এ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অবদানেই যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে। উল্লেখ্য এফ. ডব্লিউ টেইলর যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল কথা হলো- ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি প্রয়োগ করতে হবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে, তবেই উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

বিজ্ঞান হল সুসংবদ্ধ বা সংগঠিত জ্ঞান যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের তাগিদ দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক ফ্রেডারিক উইনস্লো টেইলর। তিনি মিডভ্যাল স্টিল কোম্পানিতে চাকুরিরত থাকাকালীন সময়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ পদ্ধতির আবিষ্কার করেন ও কার্যে প্রয়োগ করেন। এতে তিনি সুফলও পান। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতাও বেড়ে যায়। শ্রমিকদেরকে উৎসাহমূলক মজুরি প্রদান করা হয়। এতে তারাও কাজের প্রতি উৎসাহিত হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফ্রেডারিক উইনস্লো টেলর (F. W Taylor) কতকগুলো নীতি প্রচলন করেন যা টেলরবাদ নামে খ্যাত। এগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্পাদন করতে বলা হয়েছে। তিনি “Principles of Scientific Management” নামে বই রচনা করেন যা ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর এ মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থাপনা বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। তাই F. W Taylor কে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক (Father of Scientific Management) বলা হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে টেলরের পাশাপাশি যারা অবদান রেখেছেন এবং টেলরকে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন Heny L. Gant, Frame B. Gilbreth, Gilliam M. Gilbreth প্রমুখ।

জনাব টেলর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় চারটি নীতির কথা বলেছেন, যেমন-

১. চিরাচরিত রীতি পরিবর্তন করে ব্যক্তির প্রতিটি কাজের বিজ্ঞানসম্মত উন্নয়ন;
২. শ্রমিকের বিজ্ঞানসম্মত মনোনয়ন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন;
৩. ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা বৃদ্ধি;
৪. ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে যোগ্যতানুযায়ী কর্তব্য ও দায়িত্বের বণ্টন।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?

What is meant by Scientific Management?

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হল চিরায়ত ধারায় প্রচলিত ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থাপনার পরিবর্তিত রূপ। গতানুগতিক ধারায় ব্যবস্থাপনার দর্শন, সূত্র, নিয়মাবলি, পদ্ধতি, আদর্শমান প্রভৃতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের সাহায্যে সর্বপ্রথম F. W Taylor যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, তা-ই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা।

আমরা জানি যে, বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত ক্ষেত্র। তাই সাধারণ ব্যবস্থাপনায় সুসংবদ্ধ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের ব্যবহারকেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হিসেবে অভিহিত করা যায়। আবার বিস্তৃত অর্থে বলা যায় যে, প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ, গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক যখন ব্যবস্থাপনার প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, দর্শন, বিশ্বাস, নিয়ম-কানুন, সূত্র, পদ্ধতি

ইত্যাদির উন্নয়ন করে উৎপাদনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়, তখন এরূপ ব্যবস্থাপনাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলা যায়।

এফ, ডব্লিউ টেলর তাঁর "Principles of Scientific Management" পুস্তকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবেঃ

Science, not rule of thumb;
Harmony, no discord;
Co-operation, not individualism;
Maximum output in lieu of limited scale;
The development of each man to his greatest efficiency.

অর্থাৎ বিজ্ঞান, টিপসহির নীতি নয়;
কলহ নয়, সমঝোতা;
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, সহযোগিতা;
সীমিত উৎপাদনের বদলে সর্বাধিক উৎপাদন;
ব্যক্তির সর্বাধিক দক্ষতার উন্নয়ন।

Samule C. Certo এর ভাষায়, কার্যসম্পাদনের জন্য সবচেয়ে ভাল একটি পদ্ধতির ওপর যে ব্যবস্থাপনা জোর দেয়, তাই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। (The process of finding òne best way'has become known s scientific management.)

R. W. Griffin বলেন, "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা শ্রমিকদের ব্যক্তিক কর্মদক্ষতা উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। (Scientific management in concerned with improving the performance of individual workers.)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা পাওয়া যায়ঃ-

১. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিটি কার্যের একটি আদর্শমান সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা;
২. এটি গতানুগতিক ব্যবস্থাপনার একটা পরিবর্তিত রূপ;
৩. এটি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজের পরিবেশ ও সহযোগিতা আনয়ন করে;
৪. এটি গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে;
৫. এটি শ্রমিক-কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যখন প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও সূত্রাবলির মধ্যে বিজ্ঞানের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়, তখন তাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Scientific Management

বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনাই হল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার দরুন এটি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। নিচে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. **ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ (Comprehensive Use of Science in Management)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল কর্মীদের প্রত্যেকটি কাজে বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়। আন্দাজে কোনো কাজ করা হয় না। কর্মীরা পূর্ব হতেই জানতে পারে যে, তাঁরা কখন, কোথায়, কী কাজ, কীভাবে সম্পাদন করবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কার্যসম্পাদনে সর্বোত্তম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

২. **নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ (Selection & Training)ঃ** এ ব্যবস্থায় কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ যোগ্যতা, দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা বিচারে একজন কর্মীকে নির্দিষ্ট পদে নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও নিয়োগের পর কর্মীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতিটি কাজ বিশ্লেষণপূর্বক কার্য প্রকৃতি অনুযায়ী লোক নিয়োগ করা হয়।

৩. **সহযোগিতার উন্নয়ন (Development of Co-operation)ঃ** ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতা বিধান করা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। কোনো প্রকার হিংসা-বিদ্বেষের স্থান বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় নেই। ফলে প্রতিষ্ঠান উন্নতি সাধন করতে পারে।

৪. **শ্রম বিভাগীয়করণ (Division of Labour)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্য প্রকৃতি অনুসারে কতকগুলো বিভাগে ভাগ করা হয় এবং কর্মীদের মধ্যে যারা যে কাজে দক্ষ, তাদেরকে সেই কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। এক এক বিভাগ একেক জন বিশেষজ্ঞের ওপর অর্পণ করা হয়।

৫. **সংগঠন ও প্রক্রিয়াসমূহ সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত (Organization & Process are Established on Specific Principles)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার আওতায় গৃহীত সংগঠন ও প্রক্রিয়াসমূহ এমন আইন ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও গবেষণার দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

৬. **উত্তম পদ্ধতি প্রণয়ন (Developed The Best Way for Performance)ঃ** এ ব্যবস্থায় কাজের উত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কর্মীদের খেয়াল-খুশিমত কার্যসম্পন্ন হয় না বরং একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠান হতেই প্রবর্তন করা হয়। এতে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

৭. **উৎসাহমূলক মজুরি প্রদান (Introducing Incentive Wages)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় এমন ধরনের মজুরি প্রথা চালু করা হয় যাতে কর্মীরা বেশি করে মজুরি পাওয়ার প্রত্যাশায় বেশি করে কাজ করে। এ ব্যবস্থায় পার্থক্যমূলক মজুরি হার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ বেশি কাজ, বেশি মজুরি ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করতে উৎসাহিত করা হয়।

৮. **মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি (Creating Mental Revolution)ঃ** এ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কাজে চিরাচরিত পুরাতন প্রথা বাদ দিয়ে নতুন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা প্রথা চালু করা হয়। ফলে কর্মীদের মাঝে মানসিক বিপ্লবের সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা নতুন পদ্ধতিকে স্বাগত জানায়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে নতুনকে আঁকড়ে ধরার একটি মানসিক বিপ্লব শুরু হয়।

৯. **যৌথ প্রচেষ্টা (Joint Effort)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের জন্য সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেয়া হয়। অর্থাৎ কেউ যদি তাঁর নির্ধারিত কার্য সময়মত সম্পাদন করতে না পারে, তা হলে অন্যরা তাঁকে সহযোগিতা করে।

১০. **জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ(Ensure Accountability)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মীর মধ্যে দায়িত্ব ও কার্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এতে একদিকে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে, অন্যদিকে কার্যে গাফিলতির জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়ী করা যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির উচ্চ চূড়ায় পৌছাতে সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীর কাজ ঃ	শিক্ষার্থীগণ ধ্রুপদী ও নব্য-ধ্রুপদী মতবাদের মধ্যে পার্থক্য, ধ্রুপদী মতবাদের সমালোচনা, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ও নীতি সম্পর্কে খাতায় লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তনকে সুষ্ঠুভাবে কার্যে প্রয়োগের জন্য ধ্রুপদী মতবাদের উৎপত্তি হয়। তবে এ তত্ত্বে কর্মীকে অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এ ধারণা পরিবর্তন করে শ্রমিক-কর্মীদেরকে সামাজিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ (Neo-classical) এর বিকাশ ঘটে। এ মতবাদ অনুযায়ী কর্মীরা সর্বাধিক পরিশ্রম করে এবং দক্ষতানুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মীরা মনোযোগ দিয়ে কাজ করে, এখানে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া কম।

এ মতবাদ অতিমাত্রায় যান্ত্রিক।এ মতবাদ মানবিক।বিভিন্ন গবেষক এ তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। এ তত্ত্বের অনুমিতিগুলো অবাস্তব। এতে যে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারোপযোগী নয়। এতে ঊর্ধ্বতনের আচরণ আমলাতান্ত্রিক অর্থাৎ কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে চলতে হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল কথা হলো- ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি প্রয়োগ করতে হবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে, তবেই উৎপাদনশীলতা বাড়বে। বিজ্ঞান হল সুসংবদ্ধ বা সংগঠিত জ্ঞান যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে জ্ঞান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের তাগিদ দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক ফ্রেডারিক উইনস্লো টেইলর। তিনি মিডভ্যাল স্টিল কোম্পানিতে চাকুরিরত থাকাকালীন সময়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ পদ্ধতির আবিষ্কার করেন ও কার্যে প্রয়োগ করেন। এতে তিনি সুফলও পান। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতাও বেড়ে যায়। জনাব টেইলর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় চারটি নীতির কথা বলেছেন, যেমন- চিরাচরিত রীতি পরিবর্তন করে ব্যক্তির প্রতিটি কাজের বিজ্ঞানসম্মত উন্নয়ন, শ্রমিকের বিজ্ঞানসম্মত মনোনয়ন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে যোগ্যতানুযায়ী কর্তব্য ও দায়িত্বের বণ্টন।

পাঠ-২.৩ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধা, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপসমূহ

Advantages & Disadvantages of Scientific Management, Steps of Scientific Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধা বলতে পারবেন;
- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা

Advantages of Scientific Management

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার চেয়ে সার্বিকভাবে কার্যকর ও ফলদায়ক বলে এ ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদনের জন্য সভ্যতার অবদান বা আশীর্বাদ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। নিচে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা থেকে বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত সুবিধাবলির ভিত্তিতে এর উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা বা এটি ব্যবহারের পক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা করা হলঃ

১. **উৎপাদন বৃদ্ধি (Increase Production)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল সুর হল উৎপাদন বৃদ্ধি। F. W. Taylor এর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রতিটি সূত্র ও গবেষণা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভাবনীয়রূপে কার্যকর প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে উৎপাদনশীল পরিবেশ নিশ্চিত হয় বলে উৎপাদনের মাত্রা সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পায়।

২. **মুনাফা অর্জন (Earn Profit)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মুনাফা অর্জনের একটি অন্যতম হাতিয়ার। যদি পদ্ধতিগতভাবে উৎপাদন কার্য ও ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কার্য সম্পাদিত হয়, তাহলে বিক্রয়ের পরিমাণ অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফাও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।

৩. **শ্রমিকের কল্যাণ (Welfare of Labours)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবে রূপায়িত হলে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে ও মজুরি বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটে ও উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ পায়। ফলে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়। অর্থাৎ সার্বিকভাবে শ্রমিকদের কল্যাণ সাধিত হয়।

৪. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Improving Standard of Living)ঃ** এ ব্যবস্থাপনার ফলে উৎকৃষ্ট পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ নিশ্চিত হয় বলে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়। এতে শ্রমিক-মালিকসহ সকলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

৫. **সাংগঠনিক সুবিধা (Organizational Advantages)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার ত্রুটিমুক্ত কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করে। প্রতিষ্ঠানের পদগত বিন্যাস, আনুষ্ঠানিক কাঠামোগত সম্পর্কের পটভূমি রচনা এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে।

৬. **সামাজিক উন্নয়ন (Social Development)ঃ** কোনো দেশের সামাজিক উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অবদান অসামান্য। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এ ব্যবস্থাপনা সার্থকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে দক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান, জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

৭. **সর্বোত্তম পন্থা উদ্ভাবন (Innovate the Best Way)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল কার্য সম্পাদনের জন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থাটি আবিস্কার করা, যাতে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করা যায়। সময় নিরীক্ষা, গতি নিরীক্ষা, ক্লান্তি নিরীক্ষা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার গবেষণারই ফসল।

৮. **দক্ষতা বৃদ্ধি (Increasing Efficiency)ঃ** শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদিত হবে। এতে প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক-কর্মী সকলেই লাভবান হবে। তাছাড়া শ্রমিকরা উত্তম পন্থায় কার্য সম্পাদন করে বিধায় তাদের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

৯. **ব্যয় হ্রাস (Reducing Costs)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে গতি, সময় ও ক্লান্তি নিরীক্ষার মাধ্যমে কাঁচামালের ব্যয় হ্রাস করা যায়। তাছাড়া, শ্রমিকগণ নির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করে বিধায় অপচয় হয় না। এভাবে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হ্রাস পায়।

১০. **উৎসাহমূলক মজুরি ব্যবস্থা চালুকরণ (Introducing Incentive Wages System)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় উৎসাহমূলক মজুরি প্রথা চালু করা হয়। এতে বলা হয় যে, যারা সময়মত ভালভাবে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবে, তাদের জন্য ভাল মজুরির ব্যবস্থা করা হবে। আর যারা তা পারবে না, তাদের জন্য কম মজুরির ব্যবস্থা করা হয়। ফলে শ্রমিকগণ সকলেই উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করার প্রয়াস চালায়।

১১. **কার্য পরিবেশের উন্নয়ন (Improving Work Environment)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল কথা হল কার্যক্ষেত্রে সবকিছুই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে করতে হবে। কার্য পরিবেশও এর বাইরে নয়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা উন্নত কার্য পরিবেশের ওপর গুরুত্বারোপ করে। কার্যের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

১২. **গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত গবেষণা চালিয়ে যাওয়া এবং কার্য পন্থার উন্নয়ন সাধন করা। এ ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি ও জ্ঞানের উন্নয়ন সাধন করা হয় এবং তা প্রতিষ্ঠানের কার্যে প্রয়োগ করা হয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অসুবিধাসমূহ
Disadvantages of Scientific Management

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের ফলে যেকোনো প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই উন্নতি করতে পারে। কারণ এর ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, দক্ষতার উন্নতি ঘটে, অপচয় হ্রাস পায়, উন্নত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহার করা যায়। এ সুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও এর কিছু অসুবিধা রয়েছে। এ কারণে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে এর সমালোচনা করা হয়েছে। নিচে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অসুবিধা বা সমালোচনা তুলে ধরা হলঃ

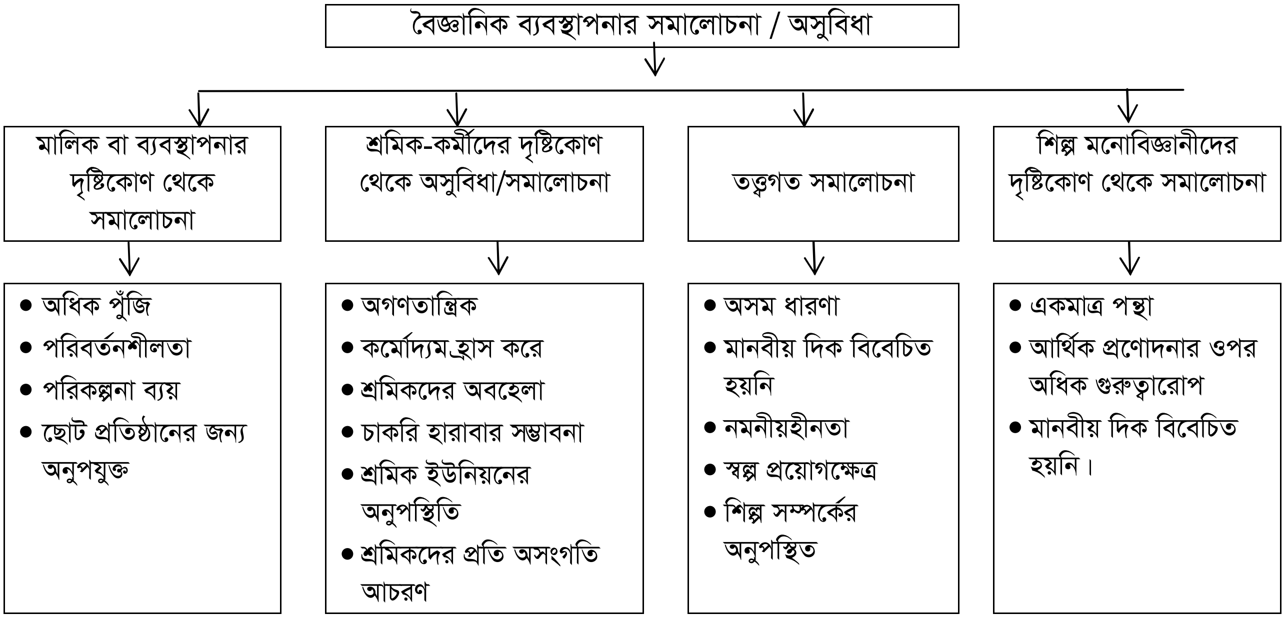

(ক) মালিক বা ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা বা অসুবিধাঃ
Disadvantages or criticism on the viewpoint of owner or managers:

১. **অধিক পুঁজি (Huge Capital)ঃ** প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কারণ এর জন্য নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, সময় নিরীক্ষা, গতি নিরীক্ষা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করতে হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। উক্ত কার্যাবলির ওপরই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে।

২. **পরিবর্তনশীলতা (Flexibility)ঃ** এ ব্যবস্থাপনা সবসময় পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য পরিবর্তনশীলতাকে সমর্থন করে। সমালোচকদের দৃষ্টিতে এটি অগ্রহণযোগ্য। কারণ যেকোনো পরিবর্তন অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৩. **পরিকল্পনা ব্যয় (Planning Cost)ঃ** চিন্তাশীল কাজের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পৃথক পরিকল্পনা কক্ষের সুপারিশ করে। কিন্তু অনেকের মতে এটি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করে। কারণ আলাদা পরিকল্পনা কক্ষের জন্য বা বিভাগের জন্য আলাদা পরিকল্পনা বিশারদ নিয়োগ করতে হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৪. **ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুপযুক্ত (Not suitable for Small Enterprise)ঃ** ছোট আকারের প্রতিষ্ঠানের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা যায় না। কারণ সময় নিরীক্ষণ, গতি নিরীক্ষণ, আধুনিক যন্ত্র স্থাপন প্রভৃতি ব্যয় সংকুলান করা ক্ষুদ্রায়ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়।

(খ) শ্রমিক-কর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা বা অসুবিধাঃ
Disadvantages or critticism in the viewpoint of labours:

১. **এটি অগণতান্ত্রিক (Indemocratic)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদেরকে কড়া নিয়মের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। এখানে তাঁদের কোনো ব্যাপারেই করার কিছু থাকে না। তাই এটি অগণতান্ত্রিক।

২. **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা শ্রমিকদের কর্মোদ্যম হ্রাস করে (Reduce work forces of labours)ঃ** গতানুগতিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক কর্মীরা তাঁদের ইচ্ছেমত কাজ করতে পারত। কিন্তু এ ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নির্ধারিত ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ছকে কাজ করতে হয় বিধায় এতে তাদের কর্মোদ্যম হ্রাস পায়। এটি শ্রমিকদের কাজে একঘেয়েমী আনে এবং তাঁদেরকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে পরিণত করে।

৩. **এটি শ্রমিকদেরকে অবহেলা করে (It ignores labour)ঃ** এ ব্যবস্থাপনা শ্রমিকদেরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। এ ব্যবস্থাপনায় মুনাফা অধিকাংশই মালিকদের পকেটে যায়। শুধু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার শ্লোগান দিয়ে শ্রমিকদেরকে অধিক খাটানো হয়। অর্থাৎ মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদেরকে অবহেলা করে থাকে। তাঁদেরকে মূল্যায়ন করা হয় না।

৪. **শ্রমিকদের চাকরি হারাবার সম্ভাবনা থাকে (Possibility of losing job)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় উন্নত ধরনের স্বয়ংক্রিয় শ্রম সংক্ষেপ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ফলে অদক্ষ ও অতিরিক্ত শ্রমিকদের চাকরি হারাবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিতে কম সংখ্যক শ্রমিক কর্মীর প্রয়োজন হয়।

৫. **শ্রমিক ইউনিয়নের অনুপস্থিতি (Absence of trade union)ঃ** এ ব্যবস্থাপনার ফলে ক্রমান্বয়ে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া পূরণ হয়ে যায়। ফলে ইউনিয়নের মাধ্যমে দরকষাকষি করে দাবি আদায়ের প্রয়োজন হয় না। এতে শ্রমিক সংঘের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

৬. **শ্রমিকদের প্রতি অসংগত আচরণ (Misconduct with labours)ঃ** এ ক্ষেত্রে যে শ্রমিকগণ বেশি কাজ করতে পারে তাঁদের প্রতি ভাল আচরণ করা হয়, আর যে শ্রমিকরা কাজ কম করতে পারে তাঁদের প্রতি বিরূপ আচরণ করা হয়। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের যন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

(গ) তত্ত্বগত অসুবিধা/সমালোচনাঃ
Theoritical Disadvantages/Critticism:

১. **অসম ধারণা (Discriminatory Idea)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শুধু উৎপাদন সম্পর্কে বলা হয়েছে, অন্য ব্যবস্থাপনা যেমন- বাজারজাতকরণ, অর্থ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়নি। তাই এটি অসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা।

২. **মানবিক দিক বিবেচনা করা হয়নি (Human side is not considered)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের মানবিক দিক বিবেচনা করা হয়নি। এখানে শুধু চিরাচরিত এক্স তত্ত্ব **(X-theory)** ব্যবহার করা হয়েছে এবং শ্রমিকদেরকে যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

(ঘ) শিল্প মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে অসুবিধা/সমালোচনাঃ
Disadvantages or critticism in view of Psychologist:

১. **একমাত্র পন্থা (Single way)ঃ** এ ব্যবস্থাপনার শুধু একমাত্র পন্থায় কাজ সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কার্য সম্পাদনের আরো অনেক পদ্ধতি থাকতে পারে। তাই কার্য সম্পাদনের একমাত্র পন্থাই যথেষ্ট নয়।

২. **আর্থিক প্রণোদনার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ (Emphasis on financial incentive)ঃ** প্রণোদনার ক্ষেত্রে শুধু আর্থিক সুবিধার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আর্থিক সুবিধার পাশাপাশি অনার্থিক সুবিধা যেমন- চাকরির নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় এগুলো বিবেচনা করা হয়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলেও এর বাস্তবসম্মত উপযোগিতা সার্বজনীন, আবেদনময়, গতিশীল, উৎপাদনের সঠিক দিক নির্দেশনা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে এ ব্যবস্থাপনার সাথে মানবিক দিক, পরামর্শমূলক নির্দেশনা প্রভৃতি যোগ হলে এটি আরো কার্যকর হবে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপসমূহ
Steps in Scientific Management

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি অনুসরণ করা। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। ফলে এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেই সাথে মানও উন্নত হয়। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে হলে কতিপয় পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। নিচে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হলো-

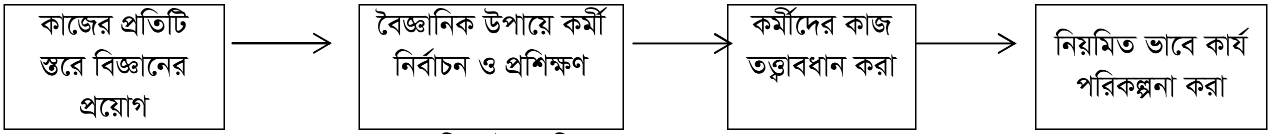

চিত্রঃ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ

১. **কাজের প্রতিটি স্তরে বিজ্ঞানের প্রয়োগ (Develop a Science for each Element of the job)ঃ** শ্রমিকদের দ্বারা কার্য সম্পাদনের প্রতিটি স্তরে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে চিরাচরিত পুরাতন প্রথা বাতিল করে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এতে কার্য সম্পাদনের সর্বোত্তম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বিধায় সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদিত হয়।

২. **বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান (Scientifically select and training of employees)ঃ** কর্মী নির্বাচনের সময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করতে হবে যাতে দক্ষ কর্মী পাওয়া যায়। অতঃপর তাদেরকে কার্যানুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। কারণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অদক্ষ শ্রমিক-কর্মীকে দক্ষ করে তোলা যায়।

৩. **কর্মীদের কাজ তদারকি করা (Supervise employes works)ঃ** শ্রমিকদের কাজে তদারকি করতে হবে। কারণ তাঁরা নির্বাচিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করছে কিনা কার্য সম্পাদনে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে হলেও কর্মীদেরকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাধ্য করা উচিত।

৪. **নিয়মিত কার্য পরিকল্পনা করা (Continue work plan)ঃ** নিয়মিতভাবে কার্যের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, শ্রমিকরা প্রণীত পরিকল্পনা মোতাবেক কার্য সম্পাদন করছে। নিয়মিতভাবে সম্পাদিত কার্য পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনার ত্রুটি সম্পর্কে জানা যায়। অতঃপর সংশোধিত আকারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এভাবে নিয়মিতভাবে কার্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি কাজ।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ ঃ	শিক্ষার্থীগণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জ্ঞান যাচাই করে নেবেন।

সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার চেয়ে সার্বিকভাবে কার্যকর ও ফলদায়ক বলে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদনের জন্য সভ্যতার অবদান বা আশীর্বাদ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এ ব্যবস্থাপনায় নানা মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়, সার্বিকভাবে শ্রমিকদের কল্যাণ হয়, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে। এটি সর্বোত্তম পন্থা। এতে উৎসাহমূলক মজুরি দেয়া হয়, উন্নত কার্যপরিবেশ নিশ্চিত হয়। এ ব্যবস্থাপনায় কতিপয় অসুবিধা রয়েছে।

পাঠ-২.৪ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার পার্থক্য, বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ

Difference Aspects or Elements of Scientific Management, Difference between Traditional Management & Scientific Management, Application of Scientific Management in the Industry of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ বলতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক

Difference Aspects or Elements of Scientific Management

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা শিল্পোৎপাদনে এক অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনাকারী। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার এ সাফল্যের অন্তরালে এর কিছু বৈশিষ্ট্য ও উপাদান একযোগে কাজ করছে। F. W Taylor বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্নক্ষেত্রে এসব সমুজ্জল উপাদানগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটি উপাদানকে মানবীয় ও অমানবীয় দিকে বিভক্ত করেছেন। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা

মানবীয় দিক	অমানবীয় দিক
১. নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ	১. উন্নত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার
২. সময় নিরীক্ষণ	২. সুষ্ঠুকার্য পরিবেশ
৩. গতি নিরীক্ষা	৩. কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা
৪. শ্রান্তি নিরীক্ষা	৪. শ্রম বিশেষায়ণ
৫. সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক	
৬. সহযোগিতা	
৭. পার্থক্যমূলক মজুরি	

চিত্রঃ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক

মানবীয় দিক

Human Aspects

উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীবৃন্দের মন-মানসিকতা, আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, অভাব ও প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত দিকগুলো মানবীয় দিক। নিচে মানবীয় দিকের ওপর আলোচনা করা হলঃ

১. **নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ (Selection & Training)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান হল নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ। কর্মীদের বিভিন্ন যোগ্যতার মানদণ্ডে যাচাই করে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হয়। তাদেরকে পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা অতি সহজেই উৎপাদন পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারে। অপরিকল্পিতভাবে লোক নিয়োগ না করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আদর্শ কর্মী নির্বাচন করতে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করাই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য।

২. **সময় নিরীক্ষণ (Time Study)ঃ** উৎপাদনে সফলতার পেছনে সময় একটি পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। শ্রমিকদের কোনো একটি কাজ করতে কতটুকু সময় ব্যয় হয় তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ধারণ করাই সময় নিরীক্ষণ। এতে কার্য

সম্পাদনের একটি আদর্শ সময় নির্ধারিত হয়। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে উক্ত আদর্শ সময়ের চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করা যাবে না। তবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সময় রক্ষণ কলাকৌশলের মাধ্যমে কাম্য সময় বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৩. **গতি নিরীক্ষা (Motion Study)ঃ** একটি কার্য সম্পাদনে অনেকগুলো গতির প্রয়োজন হয়। তাই অহেতুক গতির সংখ্যা বেশি হলে কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাই শ্রমিকদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত গতি কাম্য সীমায় বজায় রাখা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এতে শ্রমিকদের অযথা গতি কমে যাবে এবং ক্লান্তিও হ্রাস পাবে। ফলে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদিত হবে। সুতরাং গতি নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যই হল অপ্রয়োজনীয় গতি নিয়ন্ত্রণ করা।

৪. **শ্রান্তি নিরীক্ষা (Fatigue Study)ঃ** শ্রান্তি নিরীক্ষণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য আবিস্কার। এর বৈশিষ্ট্য হল, কর্মীদের কোনো কাজে অবসন্যতা, উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণ উদঘাটন করতঃ তা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এতে কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে ক্লান্তি দূর হয় এবং কাজে সতেজতা আসে।

৫. **সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক (Cordial Relationship)ঃ** মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক ও সুমধুর সম্পর্কের উপস্থিতি আদর্শমানযুক্ত উৎপাদনের পূর্বশর্ত। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় তাই সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৬. **সহযোগিতা (Co-operation)ঃ** সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য, উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার পূর্বশর্ত। কর্মীবৃন্দের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা, দলগত সম্পর্ক ও সমঝোতা এবং আন্তরিকতা কর্মীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৭. **পার্থক্যমূলক মজুরি হার (Differential Wage Rate)ঃ** F. W. Taylor তাঁর পুস্তকে পার্থক্যমূলক মজুরি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের মজুরির প্রধান সুর হল- যোগ্যতার বিভিন্নতার কারণে মজুরির হারও বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীকে বিভিন্ন হারে মজুরি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থা সফল কার্যসম্পাদনে প্রতিভা, দক্ষতা ও যোগ্যতা এবং নৈপুণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ।

অমানবীয় দিক

Non-human or material Aspects

উৎপাদনের সাথে কিছু কিছু অমানবীয় দিক বা বস্তুগত দিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত থাকে। এ দিকগুলোও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

১. **উন্নত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি (Using quality raw materials and equipments)ঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা উন্নতমানের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে। আর উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উন্নতমানের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার আবশ্যক।

২. **সুষ্ঠুকার্য পরিবেশ (Proper work environment)ঃ** কার্যের উন্নত পরিবেশ শৈল্পিক পরিবেশের বিকাশ ঘটায়। উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশও একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ উন্নয়নের সামগ্রিক ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

৩. **কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা (Centralized Planning)ঃ** কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা Taylor এর পরিকল্পনার একটি নতুন আঙ্গিক ও ধরন। এ ব্যবস্থায় কোনো প্রতিষ্ঠানে পৃথকভাবে পরিকল্পনাকক্ষ কেন্দ্রে স্থাপিত হয়। যেখান থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মসূচি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং নিম্নস্তরে বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত হয়। পরবর্তীকালে মানোন্নয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এ বিভাগের দায়িত্ব।

৪. **শ্রম বিশেষায়ণ(Specialization of labour)ঃ** শ্রম বিশেষায়ণ বলতে বিভক্ত কার্যগুলোকে দক্ষতার মানদণ্ডে বন্টনকে বুঝায়। এ নীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠানের সমগ্র কার্যাবলিকে কার্যের প্রকৃতি অনুসারে ভাগ করা হয়। অতঃপর প্রতিটি সমজাতীয় কার্যের সমষ্টির সমন্বয়ে পৃথক পৃথক বিভাগ করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগে একেকজন দক্ষ তত্ত্বাবধায়ককে দায়িত্বার্পণ করা হয়। ফলে তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কর্মী লক্ষ্যপথে পরিচালিত হয়। এটিই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার একটি বড় দিক।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত দিকগুলো F. W. Taylor এর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানেরই স্বাক্ষর বহন করে। এ দিকগুলো বাস্তবে প্রতিফলিত হলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদনশীল এবং মুনাফাজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাথে চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার পার্থক্য
Differences between Traditional Management & Scientific Management

চিরাচরিত ব্যবস্থাপনা হল গতানুগতিক ধারায় প্রাচীন ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট একটি অনিয়মতান্ত্রিক ও অবিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যার ওপর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এক উন্নত সংস্করণবিশেষ। ফলত, প্রাচীন ও আধুনিক ধারার এ দু'ব্যবস্থাপনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ-

পার্থক্যের শিরোনাম	চিরাচরিত ব্যবস্থাপনা	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
১। সংজ্ঞা (Definition)	সাধারণভাবে প্রচলিত ও গতানুগতিক ধারার ব্যবস্থাপনাকে চিরাচরিত ব্যবস্থাপনা বলে।	চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিজ্ঞানের ব্যবহার হলে তাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা বলে।
২। উদ্দেশ্য (Objective)	এর উদ্দেশ্য হল অভিজ্ঞতার আলোকে কার্য সম্পাদন করা।	এর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি কার্যে বিজ্ঞানের ব্যবহার। এতে পূর্ব হতেই সবকিছু স্থির করা হয়।
৩। গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development)	এ পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনার কোনো সুযোগ নেই। কারণ চিরাচরিতভাবে চলে আসা পদ্ধতিতেই কাজ করা হয়।	এ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের সময়, গতি ও ক্লান্তির ওপর গবেষণা করা হয় এবং তা কার্যে প্রয়োগ করা হয়।
৪। শ্রম বিভাগ (Division of labour)	চিরাচরিত ব্যবস্থাপনায় কোনো কার্যই প্রকৃতি বিবেচনায় বিভাগ করা হয় না।	এ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কার্যই সঠিকভাবে ও প্রকৃতি বিবেচনা করে ভাগ করা হয়।
৫। বিশেষায়ণ (Specialization)	এ ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়ণ নীতি অনুসরণ করা হয় না।	এ ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়ণ নীতি অনুসরণ করা হয়।
৬। কার্যের পরিবেশ (Work Environment)	এ ব্যবস্থাপনায় কার্যের পরিবেশ উন্নয়নের কোনো চেষ্টা করে না।	এ ব্যবস্থাপনায় কার্যের পরিবেশ উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।
৭। আদর্শমান স্থাপন (Fixing Standard)	কোনো কাজের জন্যই এ ব্যবস্থাপনায় আদর্শমান স্থাপন করা হয় না বা অনুসরণ করা হয় না।	প্রতিটি কাজের জন্যই এ ব্যবস্থাপনায় আদর্শমান অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ পূর্ব হতেই কাজের মান নির্ধারণ করে রাখা হয়।
৮। সময় (Time)	এ ব্যবস্থাপনায় কোনো কাজের জন্য কাম্য সময় নির্ধারিত হয় না।	এ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কাজের জন্য কাম্য সময় পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়।
৯। উৎপাদনের পরিমাণ ও মান (Quantity & Quality of production)	এ ব্যবস্থাপনার অধীনে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। মানও ঠিক থাকে না। কেননা এতে উন্নত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও জনশক্তি ব্যবহার করা যায় না।	উন্নত যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জনশক্তি এবং সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বলে এ ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ ও মান সন্তোষজনক।
১০। নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ (Selection & Training)	খেয়াল-খুশি অনুসারে লোক নির্বাচন করা হয় এবং কর্মীরা স্বীয় অভিজ্ঞতার কারণে দক্ষ কর্মীতে পরিণত হয়। তাঁদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় না।	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত ও আদর্শমানের ভিত্তিতে লোক নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়।
১১। পরিকল্পনা (Planning)	এ ব্যবস্থাপনায় পদ্ধতিগতভাবে কোনো কাজের জন্য সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করা হয় না।	ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কাজের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

পার্থক্যের শিরোনাম	চিরাচরিত ব্যবস্থাপনা	বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা
১২। দায়িত্ব ও কর্তব্য (Responsibilities & Duties)	এ ব্যবস্থাপনায় পদ্ধতিগতভাবে কোনো কাজের জন্য সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করা হয় না।	এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সকলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয়।
১৩। প্রণোদনা (Motivation)	এ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক কর্মীদের প্রেষণায় কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই।	এ ব্যবস্থাপনায় উৎসাহমূলক মজুরি প্রদানের মাধ্যমে প্রেষণার ব্যবস্থা করা হয়।
১৪। কার্য মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ (Job Evaluation & Controlling)	এ ব্যবস্থাপনায় যথাযথভাবে কার্য মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে কার্যকর নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে না।	এ ব্যবস্থাপনায় পূর্ব হতেই কাজের মান নির্ধারণ করা হয়। আর তাই কার্য মূল্যায়ন করে মান পরীক্ষা করা হয়। এতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর থাকে।

পরিশেষে উপরিউক্তভাবে চিরাচরিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কালে আমরা স্পষ্টত বলতে পারি যে, চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার চাইতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় সর্বদিক বিবেচনায় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। মূলত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা চিরায়ত ব্যবস্থাপনার চেয়ে অনেকগুণে কার্যকর, গতিশীল ও গঠনমূলক।

বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ
Application of Scientific Management in the Industry of Bangladesh

প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও গতানুগতিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্ম হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক দক্ষতার সাথে সর্বনিম্ন ব্যয়ে অধিক উৎপাদন। বাংলাদেশের শিল্পখাত অনুন্নত এবং এর জন্য দায়ী হলো গতানুগতিক ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগ। তাই বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে আশানুরূপ উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগে সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। সেগুলোকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। নিম্নে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রয়োগে সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোকপাত করা হলো।

বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের সুবিধা
Benefits of Scientific Management Applying in Bangladesh

১. আমাদের শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের এ সক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

২. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করে শ্রমিকদের নিজ নিজ ক্ষমতা অর্জনে এবং অধিক উৎপাদনে আগ্রহী করা যায়।

৩. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কার্য ভিত্তিক কর্তব্য বণ্টন করে। ফলে যেই কাজে পারদর্শী সে কাজের দায়িত্ব পায়। এতে উৎপাদন ত্বরান্বিত হয়।

৪. শ্রমিকদের অদক্ষতা ও অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতির ফলে বাংলাদেশে উৎপাদন ক্ষেত্রে সময়, সম্পদ ও অর্থের অপচয় হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগে এসব অপচয় রোধ করা সম্ভব।

৫. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ফলে কার্যক্ষেত্রে মালিক ও ব্যবস্থাপকদের স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পায়। ফলে শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক উন্নত হয় যা প্রতিষ্ঠানের জন্য মঙ্গলজনক।

৬. সর্বোপরি, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকলের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। তাই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোতে এটি প্রয়োগ করা যায়।

বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের অসুবিধা/সমস্যা
Disadvantages/Problems of Scientific Management Applying in Bangladesh

১. **মূলধনের অভাবঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুরাতন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা এবং গবেষণা পদ্ধতির প্রবর্তন করে। এ জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশের শিল্প মালিকরা পুঁজি স্বল্পতায় ভোগে। তাই এসব পদ্ধতি ও প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্ভব হয় না।

২. **অদক্ষ শ্রমিক-কর্মীঃ** শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগে দক্ষ শ্রমিক-কর্মী প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ শ্রমিক-কর্মীর অভাব রয়েছে।

৩. **বেকারত্বঃ** আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে অদক্ষ কর্মীরা কাজ হারাতে পারে। আবার, কর্মীর প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের কারণে বেকারত্ব দেখা দিতে পারে।

৪. **নমীয়তার অভাবঃ**প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে টিকে থাকার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিয়মনীতি ও রীতি-পদ্ধতি প্রয়োগ করলে তা সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। এতে প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।

৫. **আর্থিক ক্ষতিঃ** এমনিতেই আমাদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল। তার ওপর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ে। এতে প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৬. **শ্রমিক অসন্তোষঃ** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ফলে অনেক সময় শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠানের নতুন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতির সাথে তাল মেলাতে পারে না। ফলে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭. **বিশেষজ্ঞদের অপ্রতুলতাঃ** বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কর্মীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সম্ভব হয় না। এতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ব্যর্থ হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগে সুবিধার তুলনায় সমস্যাই বেশি। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ এবং ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে হবে। আবার সরকার, মালিক, শ্রমিক প্রত্যেকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমস্যাগুলো অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব। তাই বৃহদায়তন উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ ঃ	শিক্ষার্থীগণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক ও বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ সম্পর্কে লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা শিল্পোৎদনে এক অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনাকারী। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার এ সাফল্যের অন্তরালে এর কিছু বৈশিষ্ট্য ও উপাদান একযোগে কাজ করছে। F. W. Taylor বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্নক্ষেত্রে এসব সমুজ্জল উপাদানগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিটি উপাদানকে মানবীয় ও অমানবীয় দিকে বিভক্ত করেছেন। মানবীয় দিকগুলো হলোঃনির্বাচন ও প্রশিক্ষণ, সময় নিরীক্ষণ, গতি নিরীক্ষা, শ্রান্তি নিরীক্ষা, সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক, সহযোগিতা, পার্থক্যমূলক মজুরি। অমানবীয় দিকগুলো হলোঃ উন্নত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার, সুষ্ঠুকার্য পরিবেশ, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা, শ্রম বিশেষায়ণ। চিরাচরিত ব্যবস্থাপনা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাথে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পখাত অনুন্নত এবং এর জন্য দায়ী হলো গতানুগতিক ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োগ। তাই বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে আশানুরূপ উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ। তবে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগে সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। সেগুলোকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

পাঠ-২.৫ আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা, উপাদান, কার্যাবলি, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক

Theory of Bureacracy, Elements of Bureacracy, Functions of Bureaucracy, Posiitive& Negative Aspects of Bureaucracy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- এর উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এর কার্যাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে বিশদভাবে বলতে পারবেন।

আমলাতন্ত্র মতবাদ

Theory of Bureacracy

অথবা, *Max Weber* এর আমলাতান্ত্রিক তত্ত্বটি কী

ইংরেজি `Bureacracy' শব্দের বাংলা অর্থ হলো আমলাতন্ত্র, যা দ্বারা আমলাদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। একটি প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে- নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কার্যাবলি পরিচালনার জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, তা-ই আমলাতন্ত্র। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) আমলাতন্ত্র মতবাদের জনক। তাঁর মতে “আমলাতন্ত্র হলো এমন একটি পদ্ধতি যা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের খাম-খেয়ালিপনার ওপর নির্ভর না করে যৌক্তিক উপায়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।” (An approach that emphasizes the need for organizations to operate in a rational manner rather than relying on the arbitrary whims of owners and managers.)

তিনি আমলাতন্ত্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন:

- শ্রম বিশেষীকরণ
- আনুষ্ঠানিক নিয়ম-পদ্ধতি
- নৈর্ব্যক্তিকতা
- পদসোপানের স্পষ্টতা
- মেধার ভিত্তিতে পেশার উন্নয়ন।

বোভি (Bovee) ও তাঁর সহযোগিদের মতে, “আমলাতন্ত্র হলো এমন একটি পদ্ধতি যা একটি কাঠামোবদ্ধ সংগঠনের ওপর জোর দেয়। যেখানে আনুষ্ঠানিক নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পদ ও কর্তৃত্ব নির্ধারিত হয়।” (Bureaucracy is a management approach that emphsizes a structured organization in whcih positions and authority are defined according to formal rules.)

পরিশেষে বলা যায় যে, আমলাতন্ত্র হলো এমন একটি পদ্ধতি যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিচালনা করা হয় এবং যেখানে প্রতিটি পদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও জবাবদিহিতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়।

আমলাতন্ত্রের জনক Max Weber এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

A little Biography of Max Weber, Father of the Bureacracy

বিখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী Max Weber ১৯৪৬ সালে জার্মানির এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের রাজনীতি ও সমাজের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক ছিল। তিনি নিজেকে পেশাদার পরামর্শক, অধ্যাপক ও লেখক হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি এত ভাল লেখা-পড়া জানতেন যে, বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখা তাঁর পক্ষে খুব সহজ কাজ ছিল, যেমন-

ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও দর্শন ইত্যাদি। এ সকল শাখার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন ব্যবস্থাপনায়। এ ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন যে, প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর যৌক্তিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। তাঁর এ ধারণাকে প্রকাশ করতে যেয়ে তিনি শ্রেণি বৈষম্য ও স্বজনপ্রীতির বিষয়টি মাথায় রাখেন। উদাহরণস্বরূপ- তিনি দেখেছেন যে, প্রুসিয়ান সেনাবাহিনীতে বা সরকারি বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে অভিজাত বা ধনী পরিবারের সদস্যরাই সুযোগ পেত। এমতাবস্থায়, Max Weber অনুভব করেন যে, এটা মস্তবড় অন্যায় এবং এতে মানব সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া একজন কর্মীর চেয়ে ভাল জানা-শোনা যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা অধিক ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর। যখন তাঁর এ কাজ ১৯৪০ সালে ইংরেজিতে অনুদীত হয়, তখন অনেক আমেরিক্যান ব্যবস্থাপনা বিশারদ তাঁর এ ধারণা প্রতিষ্ঠান ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার দিক-নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে আমলাতন্ত্রে অধিক মাত্রায় নিয়ম-কানুন ও লাল ফিতার দৌরাত্মের কারণে এটিকে অনেকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকে। তথাপি, Max Weber কর্তৃক প্রদত্ত আমলাতন্ত্রের অনেক সুবিধা রয়েছে - যা প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে।

আমলাতন্ত্রের উপাদান
Elements of Bureacracy
অথবা, *Max Weber* এর আমলাতান্ত্রিক তত্ত্বের উপাদান বা মূলনীতি

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় যুক্তিযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া তথা কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রচেষ্টাই হলো আমলাতন্ত্র। এতে স্বজনপ্রীতি, ব্যক্তিগত খাম-খেয়ালিপনা প্রভৃতি পরিহারপূর্বক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। আমলাতন্ত্রের উপাদানগুলো নিম্নরূপঃ

১. **ক্রম পর্যায় বা ধাপ** (Hierachy)ঃ আমলাতন্ত্রে বিস্তৃত লক্ষ্যকে কতকগুলো উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়। অর্থাৎ কার্য সম্পাদনের সুবিধার জন্য লক্ষ্যকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে ছোট ছোট এককে ভাগ করা হয়। এটি বিশেষীকরণের ওপর অধিক জোর দেয় এবং বিশেষ অবস্থানের ওপর কার্যভার ন্যস্ত করে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত আইনানুগভাবে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। প্রতিটি তত্ত্বাবধায়কের অফিসই তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। ধাপগুলো নিয়মানুযায়ী ওপর থেকে নিচে নেমে আসে এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি একটি সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক কার্যক্রমে পরিণত করে।

২. **পেশাগত গুণ (Professional Qualities)ঃ** আমলাতন্ত্র একটি যৌক্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আমলাতন্ত্রে মেধা ও যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে পক্ষপাতহীনভাবে কর্মী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়। পদোন্নতি, জ্যেষ্ঠতা, সাফল্য ইত্যাদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিচারের ওপর নির্ভর করে। আমলাতন্ত্র পেশার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করে। সর্বোপরি, আমলাতন্ত্র সর্বক্ষেত্রেই পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে।

৩. **আইনকানুন এবং পদ্ধতি (Rules, Regulations and procedure)ঃ** আমলাতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন-কানুন ও পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত। এটি যুক্তিযুক্ত নৈর্ব্যক্তিকতা এবং পৃথকীকরণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। এতে নথির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আদেশ, নির্দেশ ও কার্যাবলী সব সময় নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে। আর নিয়মের বাইরে কোনো কাজ করা যায় না।

৪. **আইনানুগ ক্ষমতা (Legal Authority)ঃ** আমলাতন্ত্রে বিধিবদ্ধ ক্ষমতা অফিসের ওপর ন্যস্ত করা হয়। যে ব্যক্তি অফিস পরিচালনা করে, সে অফিসের ওপর বর্তমান বিধিবদ্ধ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ ক্ষমতার ওপর ব্যক্তিগতভাবে তার মালিকানা থাকে না। এটা অফিসের একটি অংশ। সাংগঠনিক কাঠামোই এ ধরনের ক্ষমতার উৎস।

৫. **নৈর্ব্যক্তিকতা (Impersonality)ঃ** ম্যাক্স ওয়েভার মনে করেন প্রতিটি ঘটনাই নৈব্যক্তিকভাবে দেখা উচিত। অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে কে করেছে সেটা বিবেচ্য বিষয় নয় বরং কী করেছে সেটাই মূল্যায়ন করা উচিত। অর্থাৎ ব্যক্তির উপস্থিতি এখানে গৌণ বলে ধরা হয় এবং ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কাজই প্রধান। তাছাড়া, কোনো ব্যক্তিই নিয়মের বাইরে নিজের ইচ্ছামত কিছু করতে পারবে না।

৬. **প্রশিক্ষণ (Training)ঃ** প্রশিক্ষণ আমলাতান্ত্রিক তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ পদ্ধতিতে কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে থাকে। এতে কর্মী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে নিজের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ পায়। ফলে প্রতিষ্ঠান দক্ষ কর্মীর সেবা পেয়ে থাকে।

৭. **শ্রমবিভাগ (Division of Labour)ঃ** শ্রম বিভাগ আমলাতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। সংগঠনের কার্যাবলিকে কতিপয় অংশে ভাগ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দায়িত্ব দেয়া হয়। অর্থাৎ যে কর্মী যে কাজে দক্ষ, তাকে সে-ই কাজই দেয়া হয়।

৮. **সুষ্ঠু সংরক্ষণের ব্যবস্থা (Arrangement of Accurate Record)ঃ** কর্মীদের নিকট লিখিতভাবে আদেশ-নির্দেশ জারি করা হয়। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন কাগজপত্র ও নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে যেকোনো সময় কোনো পুরাতন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত উপাদান বা নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব বা মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এ মতবাদ অনুসরণ করে ব্যবস্থাপনা সহজেই সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি
Functions of Bureaucracy

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন পরিচালনা করাই আমলাতন্ত্রের মূল কাজ। এ ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করা হয়। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. **বিশেষীকরণঃ** আমলাতন্ত্র মূলত একটি বিশেষীকরণ ব্যবস্থা। এখানে পক্ষপাতহীনভাবে কেবল যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মী নির্বাচন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি পদের কার্যাবলি বিভাজন করার মাধ্যমে কার্যগুলোকে অতি সহজভাবে সম্পাদন করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি কর্মীকে তার অবস্থানে কার্য সম্পাদনে দক্ষ করে তোলে। এভাবে আমলাতন্ত্র বিশেষীকরণকে কার্যকর করে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২. **কাঠামোঃ** আমলাতন্ত্র নির্ধারিত কাঠামোর বাইরে কোনো কাজ করে না। এটি কাঠামো তৈরির মাধ্যমে সংগঠনের আকার ও আয়তন ঠিক করে। কাঠামোতে কর্মীদের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়। এতে নির্দেশনা ও আদেশের ঐক্য রক্ষা করা হয়। প্রতিটি স্তরের ওপর তার ঊর্ধ্বতন তত্ত্বাবধায়কের নিয়ন্ত্রণ থাকে। অধস্তনরা কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দায়ী থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোর মধ্যে একটি যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কাঠামোর আওতায় কার কাজ কী হবে, কে কার নির্দেশ পালন করবে ইত্যাদি বিষয় নির্দেশনা থাকে। ফলে কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

৩. **নিশ্চয়তা ও স্থায়িত্বঃ** আমলাতন্ত্রের নিয়ম-কানুন, কাঠামো, পেশাগত দিক ও অন্য উপাদানগুলো ভবিষ্যৎ নিশ্চিত এবং প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান করে। এটি প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা আনয়ন করে। এ তত্ত্ব বলে দেয় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলাই কাজে গতিশীলতা আনে।

৪. **যৌক্তিকতাঃ**আমলাতন্ত্র কর্মী নিয়ন্ত্রণের একটি যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি। এতে যৌক্তিকভাবে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার ফলে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ কম থাকে।

৫. **গণতন্ত্রঃ** আমলাতন্ত্র কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য পেশাগত দক্ষতার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ফলশ্রুতিতে পেশাজীবীদের মতামত গ্রহণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র চর্চার একটি সুযোগ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়।

৬. **সৃজনশীলতাঃ** আমলাতন্ত্রে সৃজনশীলতার সুযোগ রয়েছে। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীলতার বিকাশে আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কর্মীরা সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন ও মননশীলতা বিকাশের সুযোগ পেয়ে থাকে। ফলে নিজ দক্ষতার বলে কর্মীরা সংগঠনে যোগ্যতম স্থান ও পদ লাভ করে।

আমলাতন্ত্রের ইতিবাচক দিক বা সুবিধাগুলো
Posiitive Aspects of Bureaucracy

আমলাতন্ত্রের প্রবক্তা ম্যাক্স ওয়েবার আমলাতন্ত্রকে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেন। আমলাতন্ত্রের কতকগুলো সুবিধা বা ইতিবাচক দিক রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. **আনুষ্ঠানিক কাঠামোঃ** আমলাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। এখানে সংগঠনের নীতি, আদর্শ, ও নিয়ম-কানুন নির্ধারিত থাকে এবং কর্মীদের তা অনুসরণ করে চলতে হয়। কাঠামোর বাইরে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকে জারি করা থাকে।

২. **যৌক্তিকতাঃ** আমলাতন্ত্র যৌক্তিকতার ওপর নির্ভরশীল। এ তত্ত্বে আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। ফলে এ তত্ত্বে যুক্তির ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনে কর্মরত কোনো কর্মীর প্রতি অবহেলা বা পক্ষপাত করা হয় না।

৩. **সৃজনশীলতাঃ** আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি সংগঠনের কর্মীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে। কারণ এখানে কর্মীরা সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করে। এছাড়া কর্মীদের প্রশিক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

৪. **বিশেষায়ণঃ** এ পদ্ধতিতে শ্রম বিভাগ অনুসারে দক্ষ ও যোগ্য কর্মী নিয়োগ করা হয়। ফলে একজন কর্মী একই কাজ বারবার সম্পাদনের দ্বারা বিশেষায়িত কর্মীতে পরিণত হয়। তাই সংগঠন একজন বিশেষায়িত কর্মীর সেবা পেতে থাকে। এতে কর্মী দক্ষতার সঙ্গে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়।

৫. **স্থায়িত্বঃ** স্থায়িত্ব আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির অপর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব নিয়ম-কানুন ও নির্দেশনা লিখিত ও সংরক্ষিত থাকে। ফলে একই বিষয়ে বার বার নিয়ম পরিবর্তন বা সিদ্ধান্ত নিতে হয় না। এটি স্থায়ী সংগঠনের সুস্পষ্ট লক্ষণ।

৬. **প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াঃ** আমলাতন্ত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মী বাঁছাই ও নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন কর্মী তার দক্ষতা ও পদমর্যাদা উন্নীত করার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়।

উপরিউক্ত ইতিবাচক দিকগুলোর কারণে আমলাতন্ত্র আজো সারা বিশ্বে সমাদৃত।

আমলাতন্ত্রের দোষ/অসুবিধাগুলো বা নেতিবাচক দিক
Disadvantages of Bureaucracy/ Negative Aspects

আমলাতন্ত্র আজকাল নেতিবাচক প্রশাসনিক কৌশলের প্রতীক। কেননা এর ধাপভিত্তিক কার্যক্রম কাজের গতিকে কমিয়ে দেয়। এর সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক বই ও আর্টিকেলস্ লেখা হয়েছে। তাছাড়া, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞব্যক্তিরা প্রতিনিয়তই আমলাতন্ত্রের সমালোচনা করেন। নিচে আমলাতন্ত্রের অসুবিধা বা দোষ বা নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা হলোঃ

১. **নৈর্ব্যক্তিকতাঃ** আমলাতন্ত্রে মানবিক দিককে অবজ্ঞা করা হয়। এখানে শৃঙ্খলা ও যৌক্তিকতার ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য না করে যন্ত্রপাতি ও জড় পদার্থের মতোই মনে করে। মানুষকে শুধুমাত্র উৎপাদনের বাহন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ আমলাতন্ত্রে মানবীয় সম্পর্ককে গৌণ হিসেবে ধরা হয়। এতে কর্মীরা কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ এ তত্ত্বটিকে অমানবিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. **কঠোরতাঃ** আমলাতন্ত্রের সমালোচনাকারীরা এটিকে কঠিন, স্থবির এবং অনমনীয় বলে দায়ী করে। এটি পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর অনুপযোগী। এটি নিয়ম-কানুনের কড়া অনুসরণ, রক্ষণশীলতা ও কলাকুশলতার পূজারী। এতে অত্যধিক আনুষ্ঠিকতা অনুসরণ করা হয়। ফলে কোনো পরিবর্তনকে সহজেই মেনে নিতে চায় না। বরং ঠেকানোর চেষ্টা করে। ব্যবসায় পরিবেশ পরিবর্তনশীল। তাই এক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নিতে না পারলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. **উদ্দেশ্যের স্থানান্তরঃ** আমলাতন্ত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় ব্যাপকভাবে। ফলে আমলাদের মধ্যে যৌক্তিক প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ভুলে ব্যক্তিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তাদের ব্যক্তিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জন অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়।

৪. **শ্রেণিবিন্যাসের সীমাবদ্ধতাঃ**বিশেষীকরণের সুবিধার্থে আমলাতন্ত্রে সুষ্ঠুভাবে কার্য ও ব্যক্তির শ্রেণি ভাগ করা হয়। ব্যক্তি সাধারণত তার বিভাগের বাইরে কাজ করতে পারে না। এতে অনেক সময় ও অর্থের অপচয় হয়। তাছাড়া, আমলাতন্ত্রে পুরনো পদ্ধতিকে ধরে রাখার প্রবণতা দেখা যায় এবং পরিবর্তনকে ভয় পায়। অথচ ব্যবসায় জগৎ অত্যন্ত পরিবর্তনশীল।

৫. **স্থায়িত্বের প্রবণতাঃ** কোনোপ্রতিষ্ঠানে বা সমাজে একবার আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তা চিরস্থায়ীভাবে চলতে থাকে। প্রয়োজন শেষ হওয়ার পরও একে বিলুপ্ত করা কষ্টসাধ্য হয়। কেননা আমলাতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। আমলারা সবসময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চায় এবং তাদের ক্ষমতার প্রতি মোহ সৃষ্টি হয়। তাই কোনো পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে চায় না। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে এরা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না।

৬. **উদ্বেগঃ** আইনের অতিমাত্রায় কড়াকড়ি ও পদমর্যাদাগত চাপের মাধ্যমে আমলাতন্ত্র অনেক সময় দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়। আমলাতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে। আমলাতান্ত্রিক স্পৃহা অসাধুতার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এটা মনোবল উন্নয়নের প্রতি হুমকি স্বরূপ। আমলাতন্ত্রে পদোন্নতির জন্য কর্মকর্তারা উন্মত্ত হয়ে যায় এবং তারা উর্ধ্বতনদের কাছে ক্রীতদাসের মতো খাটে। এখানে কর্মীদেরকে যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে সর্বোচ্চ উৎপাদনের কথা বলা হলেও বাস্তবে অধঃস্তন কর্মীরা কাজের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে উর্ধ্বতনের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় রত থাকে, এতে কর্মীর উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এটা ব্যবস্থাপকদের উদ্বেগ বাড়ায়।

৭. **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুন্নঃ** আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংগঠনিক নিয়ম-কানুন ও আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে কর্মীদের কাজ করতে হয়। আমলাতন্ত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ পালনে কর্মীরা বাধ্য। ফলে এ ব্যবস্থায় কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না।

৮. **দীর্ঘসূত্রিতাঃ** আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কঠোর আইন-কানুনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধ অবজ্ঞা করে আইন-কানুনকে উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ার রূপে বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া নির্বাহীরা কিছুতেই ক্ষমতা হারাতে চান না। এমতাবস্থায়, কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে অনেক বিলম্ব হয়। অনেকে এ পদ্ধতিকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বলে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ ঃ	শিক্ষার্থীগণ আমলাতন্ত্রের সংজ্ঞা, উপাদান, কার্যাবলি ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে খাতায় বিবরণ লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

ইংরেজি `Bureacracy' শব্দের বাংলা অর্থ হলো আমলাতন্ত্র, যা দ্বারা আমলাদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। একটি প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে- নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কার্যাবলি পরিচালনার জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, তা-ই আমলাতন্ত্র। জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) আমলাতন্ত্র মতবাদের জনক। তাঁর মতে "আমলাতন্ত্র হলো এমন একটি পদ্ধতি যা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবস্থাপকদের খাম-খেয়ালিপনার ওপর নির্ভর না করে যৌক্তিক উপায়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।" আমলাতন্ত্রের বেশ কিছু উপাদান রয়েছে। যেমন- পদের ক্রমপর্যায় থাকতে হবে। এটি হলো নির্দেশনা প্রবাহের চ্যানেল। আমলাতন্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আইন-কানুন ও পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেকের আইনানুগ ক্ষমতা থাকে। কাজের ক্ষেত্রে কে করেছে তা মুখ্য নয়, কি করছে তা-ই মুখ্য। আমলাতন্ত্রে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। শ্রমবিভাগ আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন পরিচালনা করাই আমলাতন্ত্রের মূল কাজ। এ ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করা হয়। আমলাতন্ত্র মূলত একটি বিশেষীকরণ ব্যবস্থা। আমলাতন্ত্র নির্ধারিত কাঠামোর বাইরে কোনো কাজ করে না। আমলাতন্ত্রের নিয়ম-কানুন, কাঠামো, পেশাগত দিক ও অন্য উপাদানগুলো ভবিষ্যৎ নিশ্চিত এবং প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান করে। আমলাতন্ত্র কর্মী নিয়ন্ত্রণের একটি যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি। আমলাতন্ত্র কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য পেশাগত দক্ষতার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। আমলাতন্ত্রের কতকগুলো সুবিধা বা ইতিবাচক দিক রয়েছে। যেমনঃ আমলাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়। আমলাতন্ত্র যৌক্তিকতার ওপর নির্ভরশীল। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি সংগঠনের কর্মীদের দক্ষাতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে। এ পদ্ধতিতে শ্রম বিভাগ অনুসারে দক্ষ ও যোগ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়। স্থায়িত্ব আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক। আমলাতন্ত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মী বাঁছাই ও নিয়োগ করা হয়। আমলাতন্ত্র আজকাল নেতিবাচক প্রশাসনিক কৌশলের প্রতীক। কেননা এর ধাপভিত্তিক কার্যক্রম কাজের গতিকে কমিয়ে দেয়। এর সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক বই ও আর্টিকেলস্ লেখা হয়েছে। তাছাড়া, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রতিনিয়তই আমলাতন্ত্রের সমালোচনা করেন। নিচে আমলাতন্ত্রের অসুবিধা বা দোষ বা নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা হলোঃ আমলাতন্ত্রের সমালোচনাকারীরা এটিকে কঠিন, স্থবির এবং অনমনীয় বলে দায়ী করে। আমলাতন্ত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় ব্যাপকভাবে। বিশেষীকরণের সুবিধার্থে আমলাতন্ত্রে সুষ্ঠুভাবে কার্য ও ব্যক্তির শ্রেণি ভাগ করা হয়। কোনোপ্রতিষ্ঠানে বা সমাজে একবার আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তা চিরস্থায়ীভাবে চলতে থাকে। আইনের অতিমাত্রায় কড়াকড়ি ও পদমর্যাদাগত চাপের মাধ্যমে আমলাতন্ত্র অনেক সময় দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংগঠনিক নিয়ম-কানুন ও আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে কর্মীদের কাজ করতে হয়। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কঠোর আইন-কানুনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠ-২.৬ প্রশাসনিক তত্ত্ব কী, বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্ত, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক

Administrative Management Approach, Features or Assumptions of Administrative Theory, Positive & Negative Aspects

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- প্রশাসনিক তত্ত্ব কী তা জানতে পারবেন।
- প্রশাসনিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্তসমূহ বলতে পারবেন।
- প্রশাসনিক তত্ত্বের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব

Administrative Management Approach

সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় শীর্ষ পর্যায়ের কার্যক্রমের সাথে জড়িত অংশটিই প্রশাসন। প্রশাসন ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণের কাজগুলো করে থাকে। এ তত্ত্বটি ব্যবস্থাপনার 'ধ্রুপদী' তত্ত্বের দ্বিতীয় উপাদান। প্রশাসনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি, উদ্দেশ্যের সঠিকতা, নিশ্চয়তা, কর্তৃত্বের বিভিন্ন ধাপ এবং পেশার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol)। তিনি এ মতবাদে ব্যবস্থাপনাকে একটি পদ্ধতিগত রূপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদে ব্যক্তির কাজকে অধিক ফলপ্রসূ করার উপায়, নীতি, কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বে Henri Fayol সামগ্রিকভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন দক্ষতার সাথে পরিচালনার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায় বা প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবস্থাপনা ধারণা তুলে ধরা হয়েছে বিধায় এটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। Henri Fayol ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং এক্ষেত্রে কার্য বিভাজন, নীতি নির্ধারণ ও নেতৃত্বদানের উপায় নির্দেশ করেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব সম্পর্কে Henri Fayol এর সহযোগীরা বলেন, Administrative management is a management approach that stresses the functional aspects of the organizaion and management by planning, organizing, leading and controlling. অর্থাৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা হলো ব্যবস্থাপনার এমন একটি মতবাদ যা সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের দ্বারা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার কার্যিক দিকে জোর দেয়। ফেয়লই প্রথম ব্যবস্থাপনাকে একটি শাস্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং দেখা যায় যে, এর কতগুলো মূলনীতি রয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া যার অধীনে কতিপয় ধারাবাহিক কার্য সম্পাদিত হয়। ব্যবস্থাপনা একটি প্রায়োগিক এবং শিক্ষণীয় বিষয়। তাই শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এবং দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সবার পক্ষেই ব্যবস্থাপক হওয়া সম্ভব।

Henri Fayol কর্তৃক প্রবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের মূল বিষয়গুলো হলোঃ

১. ব্যবস্থাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং স্বতন্ত্র মতবাদ, বিষয় বা শাস্ত্র।
২. ফেয়ল প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব হলো সর্বপ্রথম ও পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপিত তত্ত্ব এবং এটি মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। তিনি প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনার জন্য ১৪টি মূলনীতি নির্দেশ করেন।
৩. এ মতবাদে ব্যবস্থাপনাকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদন করা হয়।
৪. হেনরি ফেয়ল এ তত্ত্বে প্রমাণ করেন যে, ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদ সব প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োগ করা যায়।
৫. তিনি প্রশাসনের কাজকে ৬টি অংশে বিভক্ত করেন। যথাঃ কারিগরি, বাণিজ্যিক, অর্থ, নিরাপত্তা, হিসাবরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা। এগুলোর মধ্যে ব্যবস্থাপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেন।

প্রশাসনিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্তাবলি

Features or Assumptions of Administrative Theory

হেনরি ফেয়ল প্রবর্তিত প্রশাসনিক তত্ত্বে ব্যবস্থাপনাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সমাজের ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া এ মতবাদে ব্যবস্থাপকীয় কার্য শনাক্তকরণ এবং মৌলিক নীতি প্রণয়নের ওপরও জোর দেয়া হয়। এতে সাংগঠনিক উদ্দেশ্যার্জন সহজ হয়। যাই হোক, প্রশাসনিক তত্ত্ব কিছু অনুমিত শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা এর বৈশিষ্ট্য হিসেবেও পরিচিত। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১. এ তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পর্যালোচনা ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা ও কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

২. এ তত্ত্বানুযায়ী দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সার্বজনীন। তাই এসব কার্যাবলি সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগযোগ্য।

৩. এ তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ এবং নীতিমালার ওপর ভিত্তি করেই সংগঠনের কাঠামো গঠিত হয়।

৪. এ তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ব্যবস্থাপনা একটি কলা। তাই ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অধ্যয়ন করে যেকোনো ব্যক্তি ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক তত্ত্ব প্রয়োগ করে এর সুফল পেতে হলে উপরিউক্ত অনুমিত শর্তাবলি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

প্রশাসনিক তত্ত্বের ইতিবাচক দিক/সুবিধা

Positive Aspects of Administrative Theory/Advantages

প্রশাসনিক তত্ত্বের প্রধান প্রধান দিক বা সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **সংগঠনের ক্ষমতাঃ** প্রশাসনিক তত্ত্ব সাংগঠনিক কাঠামোতে বিধিসম্মত ক্ষমতার ওপর অত্যধিক জোর দিয়ে থাকে। এখানে ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্ষমতা সংগঠনকে সচল করার শক্তি যোগায়। ক্ষমতা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সংগঠনকে কার্যকর করে তোলে। এজন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানে অত্যধিক ক্ষমতাশালী হয়ে থাকেন। ক্ষমতার মাধ্যমেই তারা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করেন।

২. **কার্যকারিতাঃ** প্রশাসনিক তত্ত্ব মূলতঃ ব্যবস্থাপক ও পরামর্শদাতাদের দ্বারা উদ্ভাবিত। তাই এটা ব্যবস্থাপকদের নিকট অনেকটা সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য। এটি প্রতিষ্ঠানের জটিলতাকে একটি বোধগম্য কাঠামোতে রূপদান করে। তাই এটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যকর।

৩. **বৈজ্ঞানিক ভিত্তিঃ** অনেক সমালোচক মনে করেন যে, প্রশাসনিক তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং প্রশাসনিক তত্ত্বের নীতিগুলোকে প্রবাদ বাক্যের মতো মনে করে, তবুও গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এগুলো সুন্দরভাবে চলতে থাকবে। কারণ জীবনের চলার পথ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণের জন্য বসে থাকতে পারে না, সে তার আপন গতিতে চলতেই থাকবে। সুতরাং শুধুমাত্র সমালোচনার মাধ্যমে প্রশাসনিক তত্ত্বের গুরুত্বকে খাটো করা যায় না।

৪. **সমন্বয় সাধনঃ** প্রশাসনিক তত্ত্বে সাংগঠনিক কাঠামোতে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একজন নির্বাহী তার ক্ষমতাবলে সংগঠনের সব স্তরে নির্দেশনা, কার্যাবলি ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সহজেই সমন্বয় করতে পারেন। ফলে সংগঠনের কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশাসনিক তত্ত্বের নেতিবাচক দিক/সমালোচনা

Negative View/Criticisms of Administrative Theory

প্রশাসনিক তত্ত্বের সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধা এবং সমালোচনাও রয়েছে। সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. **তত্ত্বের গুরুত্ব হ্রাসঃ** উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রশাসনিক তত্ত্ব জন্মলাভ করলেও পরবর্তীকালে এর জনক হেনরি ফয়েল ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থাপনাবিদ তত্ত্বটির উন্নয়নে কাজ করেননি। তাই আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, এর গুরুত্ব কিছুটা কমে গেছে।

২. **নমনীয়তার অভাবঃ** প্রশাসনিক তত্ত্ব ধ্রুপদী মতবাদের একটি অনমনীয় মতবাদ। কিন্তু সংগঠন গতিশীল পরিবেশে কাজ করে। তাই অনেক সময় ব্যবস্থাপনার পক্ষে সংখ্যাত্মক, আচরণগত ও সিস্টেম তত্ত্ব এবং কৌশলের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় না।

৩. **সার্বজনীনতাঃ** এ মতবাদে বলা হয়েছে যে, ব্যবস্থাপনার নীতিমালা সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য এবং সর্বত্র সমভাবে প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু বাস্তবে পেশাগত সংগঠনে ব্যবস্থাপনার সব নীতিমালা সার্বজনীনভাবে এবং সমভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়।

৪. **মানবিক উপাদানের প্রতি অবহেলাঃ** সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ উপাদান হলো- মানুষ তথা শ্রমিক-কর্মী। শ্রমিক-কর্মীদের ব্যতীত প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জন সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশাসনিক তত্ত্বে শ্রমিক-কর্মীদেরকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রশাসনিক তত্ত্বে উপরিউক্ত অসুবিধা বা সমালোচনা রয়েছে। তবে এ তত্ত্ব ব্যবস্থাপনার প্রাচীন ও মৌলিক তত্ত্ব। তাই ফেয়ল কর্তৃক প্রদত্ত এ তত্ত্ব কোনোভাবেই অবহেলা করা যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ ঃ	শিক্ষার্থীগণ প্রশাসনিক তত্ত্বের, বৈশিষ্ট্য বা অনুমিত শর্ত ও সুবিধা-অসুবিধাসমূহ আলোচনাপূর্বক খাতায় লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় শীর্ষ পর্যায়ের কার্যক্রমের সাথে জড়িত অংশটিই প্রশাসন। প্রশাসন ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণের কাজগুলো করে থাকে। এ তত্ত্বটি ব্যবস্থাপনার ‘ধ্রুপদী’ তত্ত্বের দ্বিতীয় উপাদান। প্রশাসনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি, উদ্দেশ্যের সঠিকতা, নিশ্চয়তা, কর্তৃত্বের বিভিন্ন ধাপ এবং পেশার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol)। তিনি এ মতবাদে ব্যবস্থাপনাকে একটি পদ্ধতিগত রূপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেন। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদে ব্যক্তির কাজকে অধিক ফলপ্রসূ করার উপায়, নীতি, কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বে Henri Fayol সামগ্রিকভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন দক্ষতার সাথে পরিচালনার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায় বা প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবস্থাপনা ধারণা তুলে ধরা হয়েছে বিধায় এটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রশাসনিক তত্ত্ব কিছু অনুমিত শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা এর বৈশিষ্ট্য হিসেবেও পরিচিত। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলোঃ ১. এ তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পর্যালোচনা ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা ও কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ২. এ তত্ত্বানুযায়ী দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সার্বজনীন। তাই এসব কার্যাবলি সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগযোগ্য। ৩. এ তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ এবং নীতিমালার ওপর ভিত্তি করেই সংগঠনের কাঠামো গঠিত হয়। ৪. এ তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, ব্যবস্থাপনা একটি কলা। তাই ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অধ্যয়ন করে যে কোনো ব্যক্তি ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। প্রশাসনিক তত্ত্বের প্রধান প্রধান দিক বা সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ ১. প্রশাসনিক তত্ত্ব সাংগঠনিক কাঠামোতে বিধিসম্মত ক্ষমতার ওপর অত্যধিক জোর দিয়ে থাকে। ২. এটা ব্যবস্থাপকদের নিকট অনেকটা সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য। ৩. প্রশাসনিক তত্ত্বে সাংগঠনিক কাঠামোতে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

পাঠ-২.৭ হেনরি ফেয়লের পরিচিতি, ব্যবস্থাপকীয় যোগ্যতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে হেনরি ফেয়লের অবদান

Introduction of Henri Fayol, Contribution of Henri Fayol in Industrial Activities, Contribution of Henri Fayol in Formulating Managerial Qualities and Knowledge

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হেনরি ফেয়লের পরিচিতি জানতে পারবেন।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে হেনরি ফেয়লের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

হেনরি ফেয়লের পরিচিতি

Introduction of Henri Fayol

হেনরি ফেয়ল ১৮৪১ সালে ফ্রান্সের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৮-১৯১৮ সাল পর্যন্ত একটি বৃহৎ কয়লা শিল্পের মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি ব্যবস্থাপনার ১৪টি নীতির কথা তুলে ধরেছেন, যা আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক। আর এ কারণেই তাঁকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থাপনার ১৪ টি নীতি হলঃ (১) কার্যবিভাগ (২) কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বন্টন (৩) নিয়মানুবর্তিতা (৪) আদেশের ঐক্য (৫) নির্দেশনার এক্য (৬) সাধারণ স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ (৭) যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক (৮) কেন্দ্রীকরণ (৯) জোড়া-মই-শিকল (১০) শৃঙ্খলা (১১) সাম্য (১২) চাকরি (১৩) উদ্যোগ (১৪) একতাই বল। তিনি আধুনিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে "Industrial and General Administration" গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন, "Management is to forecast and plan, to organise, to command, to co-ordinate and to control.

শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে হেনরি ফেয়ল ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

১. কারিগরী কার্যাবলি (উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ ও অভিযোজন);
২. বাণিজ্যিক কার্যাবলি (ক্রয়, বিক্রয় ও বিনিময়)
৩. অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলি (মূলধনের অনুসন্ধান ও কাম্য ব্যবহার);
৪. নিরাপত্তামূলক কার্যাবলি (ব্যক্তি ও সম্পদের সংরক্ষণ);
৫. হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি (মজুত পরিগণনা, উদ্ধৃতপত্র প্রস্তুত, পরিব্যয় প্রাক্কলন ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণ)
৬. ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি (পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ)।

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ১৮৮৮ সালে যোগদানের মাধ্যমে সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োগের সুযোগ লাভ করেন। কোম্পানির আর্থিক দুরবস্থার সময় কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতা এবং কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনার আধুনিক পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানিকে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করত সক্ষম হন। প্রায় ত্রিশ বছর অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে পরিচালনার পর ১৯১৮ সালে কোম্পানি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর মতে, কোম্পানির উন্নতির অন্যতম কারণ হলো কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ। তিনি মনে করেন যে, ব্যবস্থাপনা দর্শনের পদ্ধতিগত প্রয়োগ শুধুমাত্র সাংগঠনিক কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনেও সমভাবে প্রযোজ্য। এজন্য হেনরি ফেয়লকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়ে থাকে।

যদিও ফেয়ল এবং টেলরের চিন্তাধারার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল, তথাপি দু'জনেই একই সমস্যার সমাধানকল্পে কাজ করেন। টেলর কারখানা ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে উপরের দিকে এবং ফেয়ল পরিচালকমন্ডলী থেকে নিচু পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী হন।

কমামবল্টে (এটি একটি খনি কোম্পানি হিসেবে পরিচিত ছিল) তাঁর ধারণা প্রয়োগ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে ফেয়ল ১৯১৪ সালে সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাপনার সকল তত্ত্ব সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় তা আর প্রকাশ করা হয়নি। ১৯১৬ সালে তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা Adminisration industrialle et generale হিসেবে Bulletin de la Societe de I' Industrie Minerale এ এবং পরে ১৯২৯ সালে ইংরেজিতে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর ফরাসী নির্বাহীগণ তাদের ক্রিয়াকর্ম নতুন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ শুরু করলেন। তারা মনে করেন, ফেয়ল হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তাদেরই ভাষায় কথা বলেন, তাদের সমস্যা বুঝতে পারেন এবং পরিচ্ছন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে তার মতবাদ উপস্থাপনা করেন, যা বিভ্রান্তির পরিবর্তে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। তখন তারা টেলরের মতবা থেকে সরে এসে ফেয়লের মতবাদকে নুতন করে ভাবতে শুরু করেন।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে হেনরি ফেয়লের অবদান

Contribution of Henri Fayol in Industrial Activities

আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। যাতে করে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. **কারিগরি কার্যাবলিঃ** প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদন, প্রস্তুত এবং ব্যবহারোপযোগী করার জন্য যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা যায়, তা-ই কারিগরি কার্যাবলি। Henri Fayol কারিগরি কার্যাবলিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সাধারণত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে কারিগরি কার্যভার দেয়া হয়। কারণ উৎপাদন চালু রাখতে হলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে কারিগরি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান দিতে হয়।

২. **বাণিজ্যিক কার্যাবলিঃ** প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তাকারী কার্যাবলিই বাণিজ্যিক কার্যাবলি। যেমন- বাজার পূর্বানুমান, প্রতিযোগিদের অবস্থান নির্ধারণ, ভবিষ্যত সম্ভাব্য বাজার সৃষ্টি, বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বাণিজ্যিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। বাণিজ্যিক কার্যাবলির ওপর প্রতিষ্ঠানের বাজারজাতকরণ সফলতা নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোত্তম প্রয়াস চালানো হয়।

৩. **আর্থিক কার্যাবলিঃ** পুঁজি সংগ্রহ ও পুঁজি বাজারের সাথে জড়িত কার্যাবলিকে আর্থিক কার্যাবলি বলে। আর্থিক কার্যাবলির মধ্যে হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, কর্মীদের মজুরি ও বেতন প্রদান ইত্যাদি অর্থসম্পর্কিত বিষয়াবলি জড়িত। উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পাদনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে।

৪. **নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ** প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও শ্রমিক-কর্মচারীদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে। মূলত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সম্পত্তি ব্যবহার করে কাজ করে। কিন্তু নির্বিঘ্নে কাজ করার জন্য সম্পদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করা হয়। Henri Fayol ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তামূলক কার্যাবলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

৫. **হিসাবরক্ষণ কার্যাবলিঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র পাওয়ার জন্য যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় তাকে হিসাবরক্ষণ কার্যাবলি বলে। হিসাবরক্ষণ কার্যাবলি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার দর্পণ হিসেবে কাজ করে। তাই Henri Fayol হিসাবরক্ষণ কার্যাবলিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্নায়ু কোষ হিসেবে বিবেচনা করেন।

৬. **ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলিঃ** ব্যবসায়ের কার্য সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, কর্মীসংস্থান, সমন্বয় সাধন, নেতৃত্ব ও প্রেষণা এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিকে ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি বলা হয়। Henri Fayol বলেন, Management is to foreast and plan to organizes, to command, to co-ordinate and to control.

পরিশেষে বলা যায় যে, একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে উক্ত ছয়ভাগে ভাগ করা হলে সুষ্ঠুভাবে তা সম্পাদন করা যায়। তাই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে অবশ্যই ছয়ভাগে বিভাজন করতে হবে।

ব্যবস্থাপকীয় যোগ্যতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে হেনরি ফেয়লের অবদান

Contribution of Henri Fayol in Formulating Managerial Qualities and Knowledge

Henry Fayol মনে করেন, প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের কতিপয় যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। যেমনঃ

১. **স্বাস্থ্য ও শারীরিক সক্ষমতাঃ** নেতাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মানসিক ও শারীরিক শক্তি। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী Charles Barnard নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবেষণায় ৬৯ টি গুণাবলির সন্ধান পান। তার মধ্যে অন্যতম হলো মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা। সুতরাং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক শক্তির অধিকারী হওয়া একজন নেতার অন্যতম গুণ বলে বিবেচিত হয়।

২. **বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক শক্তিঃ** একজন নেতাকে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সর্বক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। আবার, হঠাৎ কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যা তাকে শান্তভাবে মোকাবিলা করতে হয়। তাই নেতাকে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য মানসিক শক্তির অধিকারী হতে হবে।

৩. **নৈতিক গুণাবলিঃ** একজন ব্যবস্থাপক বা নেতা হচ্ছেন সদস্যদের অনুকরণের প্রতীক। সুতরাং নেতা সৎ ও ন্যায়পরায়ন না হলে, শ্রমিক ও কর্মচারীরা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কার্যাবলি সম্পাদন করতে উৎসাহিত হবে না। অর্থাৎ নেতা অসৎ হলে কর্মীরাও অসৎ হবে। এতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন বিঘ্নিত হবে। তাই একজন নেতাকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সৎ ও ন্যায়পরায়ণ নেতা চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ এবং কাজ-কর্মে সততার স্বাক্ষর রাখবে। ফলে সকলে নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করবে। তাছাড়া নিয়ম-শৃংখলা, সত্যবাদিতা, আনুগত্য, উদ্যোগ ইত্যাদি গুণাবলিও একজন ব্যবস্থাপকের থাকতে হবে।

৪. **সাধারণ শিক্ষাঃ** যেকোনো সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপককে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

৫. **ব্যবস্থাপকীয় জ্ঞানঃ** যেহেতু ব্যবস্থাপক একজন নেতা এবং নেতাকে ব্যবস্থাপকীয় কার্যসম্পাদন করতে হয়। যদি ব্যবস্থাপকীয় কলা-কৌশল ও নিয়ম-নীতি জানা থাকে তা হলে কর্মীদের উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত করা যাবে না।

৬. **বিশেষ সামথ্যঃ** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমস্যা সমাধান করার প্রয়োজন হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের বিশেষ কিছু সামর্থ্য থাকতে হবে। তা না হলে সমস্যা সমাধান করতঃ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হবে না।

৭. **অন্যান্য কার্য সম্বন্ধে জ্ঞানঃ** ব্যবস্থাপকদের অন্যান্য কিছু কার্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হয়, যেমন-

(ক) যোগাযোগ ক্ষমতাঃ নেতা সংগঠনের সর্বস্তরের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। এমতাবস্থায় নেতা দক্ষতার সাথে যোগাযোগ করে দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন। সুন্দর বাচনভঙ্গি ও শব্দ চয়ন, নেতার যোগাযোগ ক্ষমতাকে উন্নত করে।

(খ) কারিগরি ক্ষমতাঃ কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর সংগঠনের সফলতা নির্ভরশীল। একজন নেতাকে শ্রমিকদের ব্যবহৃত প্রযুক্তি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। তাই কার্য, পদ্ধতি, নীতি ও আদর্শ এবং কলাকৌশল সম্পর্কে নেতাকে কারিগরি জ্ঞান থাকতে হবে। তবেই তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যাবে।

(গ) প্রশিক্ষণদান ক্ষমতাঃ একজন নেতাকে অবশ্যই তাঁর অধীনস্থদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করার ক্ষমতা থাকতে হবে। এতে সফলতার সাথে সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

(ঘ) প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতাঃ একজন নেতাকে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয় এবং সুষ্ঠু নেতৃত্বের ওপর যাবতীয় কার্যাবলির সফলতা নির্ভর করে। তাই অধীনস্থদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য নেতাকে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ ঃ	শিক্ষার্থীগণ হেনরি ফেয়লের জীবনী, তাকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয় কেন, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কেন নীতিমালার প্রয়োজন এবং নীতিমালার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

হেনরি ফেয়ল ১৮৪১ সালে ফ্রান্সের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৮-১৯১৮ সাল পর্যন্ত একটি বৃহৎ কয়লা শিল্পের মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি ব্যবস্থাপনার ১৪টি নীতির কথা তুলে ধরেছেন, যা আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক। আর এ কারণেই তাঁকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থাপনার ১৪ টি নীতি হলঃ (১) কার্যবিভাগ (২) কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বণ্টন (৩) নিয়মানুবর্তিতা (৪) আদেশের ঐক্য (৫) নির্দেশনার এক্য (৬) সাধারণ স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ (৭) যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক (৮) কেন্দ্রীকরন (৯) জোড়া-মই-শিকল (১০) শৃঙ্খলা (১১) সাম্যা (১২) চাকরি (১৩) উদ্যোগ (১৪) একাতাই বল। তিনি আধুনিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে “Industrial and General Administration” গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন, “Management is to forecast and plan, to organise, to command, to co-ordinate and to control. শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে হেনরী ফেয়ল ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ ১. কারিগরী কার্যাবলি (উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ ও অভিযোজন); ২. বাণিজ্যিক কার্যাবলি (ক্রয়, বিক্রয় ও বিনিময়) ৩. অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি (মূলধনের অনুসন্ধান ও কাম্য ব্যবহার); ৪. নিরাপত্তামূলক কার্যাবলি (ব্যক্তি ও সম্পদের সংরক্ষণ); ৫. হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি (মজুত পরিগণনা, উর্দ্ধতপত্র প্রস্তুত, পরিব্যয় প্রাক্কলন ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণ) ৬. ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি (পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ)। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ১৮৮৮ সালে যোগদানের মাধ্যমে সাংগঠনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োগের সুযোগ লাভ করেন। কোম্পানির আর্থিক দুরবস্থার সময় কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতা এবং কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনার আধুনিক পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানিকে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করত সক্ষম হন। প্রায় ত্রিশ বছর অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে পরিচালনার পর ১৯১৮ সালে কোম্পানি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, কোম্পানির উন্নতির অন্যতম কারণ হলো কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ। তিনি মনে করেন যে, ব্যবস্থাপনা দর্শনের পদ্ধতিগত প্রয়োগ শুধুমাত্র সাংগঠনিক কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনেও সমভাবে প্রযোজ্য।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. ধ্রুপদী মতবাদ কী? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. ধ্রুপদী মতবাদের চারটি স্তম্ভ কী? এ তত্ত্বের অনুমিত শর্তসমূহ লিখুন।
৩. ধ্রুপদী তত্ত্বের উপাদানসমূহ বা প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
৪. ধ্রুপদী ও নব্য-ধ্রুপদী তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৫. ধ্রুপদী তত্ত্বের সমালোচনা উল্লেখ করুন।
৬. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৭. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো কী?
৮. বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৯. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১০. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।
১১. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করুন।।
১২. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাথে চিরাচরিত ব্যবস্থাপনার পার্থক্য লিখুন।
১৩. বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
১৪. আমলাতন্ত্র কী? আমলাতন্ত্রের উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।
১৫. আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
১৬. আমলাতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
১৭. প্রশাসনিক তত্ত্ব কী? এর বৈশিষ্ট্য বা শর্তসমূহ লিখুন।
১৮. প্রশাসনিক তত্ত্বের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।
১৯. হেনরি ফেয়লের জীবনী সংক্ষিপ্তকারে লিখুন।
২০. শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে হেনরি ফেয়লের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২১. ব্যবস্থাপকীয় যোগ্যতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে হেনরি ফেয়লের অবদান আলোচনা করুন।

তথ্য সূত্রঃ

- Kathryn M. Bartol & David C. Martin, “Management”, 2nd Edition, McGraw-Hill, INC, Newyork, 1994.
- Ricky W. Griffin, “Management” , (12th ed), AITBS publication, New Delhi.